Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমুন নাহার হেনা

রোলঃ 227020087

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমুন নাহার হেনা

রোলঃ 227020087

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাজমুন নাহার হেনা, আইডিঃ 227020087 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

নাজমুন নাহার হেনা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

নাজমুন নাহার হেনা

আইডিঃ 227020087

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র


আত্মার ব্যাধি
ও
তার প্রতিকার

প্রারম্ভিক আলোচনা

মানবজীবন দুটি অংশে গঠিত। শারীরিক এবং আত্মিক। শারীরিক অযত্নে ত্রুটি হলে যেমন করে শরীর অসুস্থ এবং দুর্বল হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি আত্মার অযত্নে ত্রুটি হলে আত্মা অসুস্থ এবং দুর্বল হয়ে পড়ে।

নিয়মিতভাবে শরীরকে পরিষ্কার না করলে, গোসল না করলে যেমন একসময় শরীরে ঘাম,ময়লা ইত্যাদি জমে শরীর নোংরা হয়ে যায় ঠিক তেমনি আত্মার নিয়মিত পরিচর্যা না করলে আত্মাও নোংরা হয়ে যায়।

আত্মা বা রূহ কি

আত্মা বা রূহ আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু আত্মা বা রূহ বা ক্বলব ছাড়া একটি শরীর মৃত। এই যে শরীর অনবরত চলছে, হৃদস্পন্দন চলছে যদি এই আত্মাটাই না থাকে তাহলে সে শরীরকে আমরা মৃতদেহ বা লাশ হিসেবেই গণ্য করি।

আত্নার রোগ কি

প্রতিটি দেশের যেমন রাজধানী রয়েছে, তেমনি মানব দেহের রাজধানী হ’ল ক্বলব। দেশের জন্য রাজধানী সুষ্ঠু রাখা যেমন যরূরী, দেহের জন্য ক্বলব সুষ্ঠু রাখা তার চেয়ে কয়েক হাযার গুণ বেশী যরূরী। সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে ক্বলবকে মুক্ত রাখা, অসুস্থতা থেকে নিরাপদ রাখা এবং অসুস্থ ক্বলবের চিকিৎসা করা প্রতিটি মানুষের জন্য অতীব যরূরী। কারণ ইসলামে ক্বলবের সুস্থতা মর্যাদাপূর্ণ এবং সুস্থ ক্বলবের অবস্থান উন্নত ও সুউচ্চ। কুরআনুল কারীমে একশ’ বত্রিশ বার ক্বলব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।[আল-মু‘জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৬৫৮।]

ক্বলব বা অন্তরই আল্লাহর দেখার বিষয়। কারণ এটি ঈমান, ইখলাছ ও তাওহীদের কেন্দ্রস্থল। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ للهَ تَعَالَى لاَيَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلِكِنْ يَّنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

‘আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে দেকবেন না; বরং তিনি দেখবেন তোমাদের ক্বলব ও কর্মের দিকে’।[মুসলিম, হা/২৫৬৪; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭, পৃঃ ২২।]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ.

'জেনে রেখো! শরীরের মধ্যে এমন এক টুকরা গোশত রয়েছে, যা সুস্থ থাকলে সারা শরীরই সুস্থ থাকে, আর এটা অসুস্থ হয়ে গেলে সারা শরীরই অসুস্থ হয়ে যায়। জেনে রেখো, আর এটাই হ'ল ক্বলব'।[*বুখারী, হা/৫২ 'কিতাবুল ঈমান'।*]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'ক্বলব সকল কিছুর মূল। যেমনিভাবে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ক্বলব হ'ল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাদশা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হ'ল তার সেনাবাহিনী। বাদশা ভাল হ'লে তার সেনাবাহিনী ভাল হয়। আর সেনাবাহিনী তখনই খারাপ হবে যখন বাদশা খারাপ হয়ে যাবে'।[*আদ-দুরূসুর রামযানিয়্যাহ, পৃঃ ১৭২।*]

মানব শরীর যেমন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। তেমনি মানব অন্তরও রোগাক্রান্ত হয়। সেই রোগগুলো চিহ্নিত করা আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের জন্য জরুরী। নয়তো অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে গাফলতি ডুবে হারিয়ে যাবে দ্বীনের পথ থেকে থেকে।

এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلاَ يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُه»

"কোনো বান্দার ঈমান ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার অন্তর ঠিক হয়। তেমনিভাবে কোনো বান্দার অন্তর ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার মুখ ঠিক হয়"।[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৩০৪৮]

আত্মার রোগের প্রকারভেদ/আত্মার রোগসমুহ কি?

আত্মার রোগের রয়েছে বিভিন্ন প্রকারভেদ। নববী যুগ থেকে শুরু এ যাবৎ কালে অসংখ্য আলেম উলামাগণ,আল্লাহওয়ালাগণ অন্তরের রোগগুলো বিভিন্ন ভাবে চিহ্নিত করেছেন। এর মাঝে -

কুদৃষ্টি,জবানের গুনাহ,গীবত,অপবাদ,চোগলখরি,মিথ্যা কথা,গালি দেওয়া,কুচিন্তা,কুধারণা,অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, অপ্রয়োজনীয় কাজ করা,নফস,হিংসা,অহংকার,লোভ, কৃপণতা,আত্মতুষ্টি, নিফাক,শাহওয়াত,অতিরিক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা,মালিন্যতা,আত্মমর্যাদাহীনতা,ইখলাস হীনতা,দুনিয়াপ্রীতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কুদৃষ্টি

আল্লহ তায়ালার অন্যতম এক নিয়ামত চোখ বা দৃষ্টি। এই চোখ বা দৃষ্টির নিয়ামাত যে পাই নি সেই শুধুমাত্র এটি অনুভব করতে পারে। আমরা যারা দু চোখে দেখতে পারে আল্লহ তায়ালার এই দুনিয়ার সকল রং সৌন্দর্য,কুরআনের কালাম দেখে পড়তে পারি আমরা খুব কম মানুষই এর কদর করতে পারি। আল্লহ তায়ালা আমাদের ক্ষমা করুন।

কুরআনে আল্লহ তায়ালা বলেন , ‘বলো, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয় বানিয়েছেন। (কিন্তু) তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করো অল্পই।’ (সুরা মুলক: ২৩)

অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে, ‘আমি কি তাকে দেইনি দুটি চোখ, একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট?’ (সুরা বালাদ: ৮-৯)

আমাদেরকে আল্লহ তায়ালার এই নিয়ামাত চোখের সঠিক ব্যবহার করা উচিত; নতুবা এটি আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি এবং শাস্তির কারণ হবে। আস্তাগফিরুল্লহ।এই পৃথিবীতে এখন কুদৃষ্টি মহামারি আকার ধারণ করেছে। প্রায় সব বয়সের মানুষই এতে আক্রান্ত হচ্ছে। সোস্যাল মিডিয়ার এই যুগে দৃষ্টি সংযত রাখা বরং এখন বড় কঠিন হয়ে পড়েছে।

কুদৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের অস্ত্র । এর মাধ্যমে সে মুমিনদের ঈমানে আক্রমণ করে এবং চরিত্র নষ্ট করে।

নবী (সা.) বলেন, ‘কুদৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তীর। আল্লাহর ভয়ে যে ব্যক্তি কুদৃষ্টি থেকে বিরত থাকে, তাকে তিনি ইমানের এমন স্বাদ আস্বাদন করান, যা সে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারে।’ (মুসতাদরাকে হাকিম)

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুরুষদের জন্যে রয়েছে যেমন আদেশ তেমনিভাবে মহিলারাদের জন্যও রয়েছে।দৃষ্টির যত্রতত্র ব্যবহারের জন্যে গুনাহে পতিত হয় উভয়েই।কোনো যুবক-যুবতী যদি চরিত্রহীন বা চরিত্রহীনা হয়ে থাকে তা হলে এর মূলে রয়েছে যত্রতত্র দৃষ্টি দেয়া।

এ ছাড়াও যৌনাঙ্গ রক্ষার পেছনে বাধা হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও গণ্য করা হয়:

যৌনকর্ম সম্পর্কীয় আলোচনা, গানের নেশা, খারাপ উপন্যাস ও খারাপ কবিতা পড়ার নেশা, শয়তানের কুমন্ত্রণার কাছে হার মানা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, দীর্ঘ আশা ও দুনিয়ার ভালোবাসা, নিয়ন্ত্রণহীন সুখভোগ এবং সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের লাগাতার অবহেলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লাহ তা‘আলা শুধু যৌনকর্মকেই হারাম করেন নি, বরং তিনি এরই পাশাপাশি সব ধরনের অশ্লীলতাকেও হারাম করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা যখন ব্যভিচারকর্মকে নিষেধ করে দিয়েছেন তখন তিনি সে সকল পথকেও নীতিগতভাবে রোধ করে দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে স্বভাবতঃ ব্যভিচারকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা পুরুষ ও মহিলা উভয় জাতিকে লজ্জাস্থান হিফাযতের পূর্বে সর্বপ্রথম নিজ দৃষ্টিকে সংযত করতে আদেশ করেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠
وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ ٣١﴾ [النور: ٣٠، ٣١]

“(হে মুহাম্মাদ) তুমি মুমিনদেরকে বলে দাওঃ যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য প্রবিত্র থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। নিশ্চয় আল্লাহ

তা'আলা তাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত। তেমনিভাবে তুমি মুমিন মহিলাদেরকেও বলে দাওঃ যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে"। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০-৩১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ ١٩﴾ [غافر: ١٩]

"তিনিই চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরের গোপন বস্তু সম্পর্কেও অবগত"। [সূরা গাফির, আয়াত: ১৯]

আল্লাহ তা'আলা কাউকে অন্য কারোর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে চক্ষুর অপব্যবহার না হয় এবং তা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨﴾ [النور: ٢٧، ٢٨]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটাই তো তোমাদের জন্য অনেক শ্রেয়। আশাতো তোমরা উক্ত উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যদি তোমরা উক্ত গৃহে কাউকে না পাও তা হলে তোমরা তাতে একেবারেই প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদেরকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে, ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তো তোমাদের জন্য পবিত্র থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত"। [সূরা আন-নূর: ২৭-২৮]

আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে মহিলাদেরকে অপর পুরুষ থেকে পর্দা করতে আদেশ করেছেন। যাতে পুরুষের লোভাতুর দৃষ্টি তার অপূর্ব সৌন্দর্যের উগ্র আকর্ষণ থেকে রক্ষা পায় এবং ক্রমান্বয়ে সে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত না হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]

"মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য (শরীরের সাথে এঁটে থাকা অলংকার বা আকর্ষণীয় পোষাক) প্রকাশ না করে। তবে যা স্বভাবতই প্রকাশ পেয়ে যায় (বোরকা, চাদর, মোজা ইত্যাদি) তা প্রকাশ পেলে কোনো অসুবিধে নেই। তারা যেন তাদের ঘাড়, গলা ও বক্ষদেশ (চেহারাসহ) মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইপো, বোনপো, স্বজাতীয় মহিলা, মালিকানাধীন দাস, যৌন কামনা রহিত অধীন

পুরুষ, নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো নিকট নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তেমনিভাবে তারা যেন সজোরে ভূমিতে নিজ পদযুগল ক্ষেপণ না করে। কারণ, তাতে করে তাদের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে, বরং হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তখনই তোমরা সফলকাম হতে পারবে"। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]

চোখ ও দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা লজ্জাস্থানকে রক্ষা করারই শামিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«غُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ»

"তোমাদের চোখ নিম্নগামী করো এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করো"।[আহমদ: ৫/৩২৩; হাকিম: ৪/৩৫৮, ৩৫৯; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২৭১; বায়হাক্বী: ৬/২৮৮]

হঠাৎ কোনো হারাম বস্তুর উপর চোখ পড়ে গেলে তা থেকে অতি দ্রুত দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। এবং এরপর ওই হারাম বস্তুতে দ্বিতীয়বার কিংবা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا عَلِيُّ! لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الْأُوْلَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

"হে 'আলী! বার বার দৃষ্টি ক্ষেপণ করো না। কারণ, হঠাৎ দৃষ্টিতে তোমার কোনো দোষ নেই। তবে ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয় দৃষ্টি অবশ্যই দোষের"।[আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৪৯; তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৭৭; আহমদ: ৫/৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৭; হাকিম: ২/১৯৪; বায়হাক্বী: ৭/৯০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম দৃষ্টিকে চোখের যিনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমনভাবে কোনো ব্যক্তির হাত, পা, মুখ, কান, মনও ব্যভিচার করে থাকে। তবে মারাত্মক ব্যভিচার হচ্ছে লজ্জাস্থানের ব্যভিচার। যাকে বাস্তবার্থেই ব্যভিচার বলা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِيْ فَزِنَاهُ الْقُبَلُ، وَالْأُذُنُ زِنَاهَا الِاسْتِمَاعُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِيْ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ»

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য যিনার কিছু অংশ বরাদ্দ করে রেখেছেন। যা সে অবশ্যই করবে। চোখের যিনা হচ্ছে অবৈধভাবে কারোর দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ, মুখের যিনা হচ্ছে অশ্লীল কথোপকথন, হাতও ব্যভিচার করে, তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে অবৈধভাবে কাউকে হাত দিয়ে ধরা, পাও ব্যভিচার করে। তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে কোনো ব্যভিচার সংঘটনের জন্য রওয়ানা করা, মুখও ব্যভিচার করে। তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে অবৈধভাবে কাউকে চুমু দেওয়া, কানের ব্যভিচার হচ্ছে অশ্লীল কথা শ্রবণ করা, মনও ব্যভিচারের কামনা-বাসনা করে। আর তখনই লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে অথবা করে না"।[আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৫২, ২১৫৩, ২১৫৪]

দৃষ্টিই হচ্ছে সকল গুনাহের মূল। কারণ, কোনো কিছু দেখার পরই তো তা মনে জাগে। মনে জাগলে তার প্রতি চিন্তা আসে। চিন্তা আসলে অন্তরে তাকে পাওয়ার কামনা-বাসনা জন্মে। কামনা-বাসনা জন্মালে তখন তাকে পাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়। দীর্ঘ দিনের ইচ্ছে প্রতিজ্ঞার রূপ ধারণ করে। আর তখনই কোনো কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। যদি এর মাঝে কোনো ধরনের বাধা না থাকে।

দৃষ্টির কুফল হচ্ছে আফসোস, ঊর্ধ্বশ্বাস ও অন্তরজ্বালা। কারণ, মানুষ যা চায় তার সবটুকু সে কখনোই পায় না। আর তখনই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, দৃষ্টি হচ্ছে তীরের মতন অন্তরকে নাড়া দিয়েই তা লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছায়। একেবারে শান্তভাবে নয়।

আরো আশ্চর্যের কাহিনী এই যে, দৃষ্টি অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আর এ ক্ষতের ওপর অন্য ক্ষত (আবার তাকানো) সামান্যটুকু হলেও আরামপ্রদ। যার নিশ্চিত নিরাময় কখনোই সম্ভব নয়।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকের বক্তব্য হলো, কুদৃষ্টির কারণে মূত্রথলি দুর্বল হয়ে যায়, যার কারণে বারবার পেশাবের ফোঁটা অথবা ধাতু নির্গত হতে থাকে। ওযু ও নামাযের ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। এছাড়াও কুদৃষ্টির কারণে পেশাবের সাথে ধাতু ক্ষয়ের রোগ দেখা দেয়। কারণ, কুচিন্তা ও কুদৃষ্টির কারণে ধাতু পাতলা হয়ে পেশাবের সাথে অথবা ঘন ঘন স্বপ্নদোষ হয়ে ধাতু ক্ষয় হতে থাকে।

এ কারণে মস্তিষ্কের দুর্বলতা, হার্টের দুর্বলতা ও অস্থিরতা, কোমরে ব্যথা, পায়ের গোছায় ব্যথা, মাথা ঘুরানো, চোখে অন্ধকার বা ঝাপসা দেখা, পড়া মুখস্থ না হওয়া বা মুখস্থ হওয়ার পর তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া, মেজাজ খিটখিটে থাকা, রাগ গোস্বা বেড়ে যাওয়া, নিদ্রাহীনতা বা নিদ্রাস্বল্পতা, মনোবল কমজোর হওয়া, কাজ-কর্মে অলসতা প্রভৃতি জটিল সমস্যাদি দেখা দেয়। [বই: কুদৃষ্টি ও তার প্রতিকার লেখক: হজরত মাওলানা শাহ হাকিম মুহাম্মাদ আখতার রহ , মুফতি রফিকুল ইসলাম আনওয়ার (অনুবাদক)]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয়কাতর হয়ে আল্লাহর তায়ালার কাছে চোখের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন-

اللّٰهُمّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرّ مَنِيِّي.

হে আল্লাহ! আমি আমার কান, চোখ, যবান, হৃদয় এবং লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই।(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৫১; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৯২)

জবানের গুনাহ

জবান বা বাকশক্তি আল্লাহ তাআলার বড় নিয়ামত ও মহা দান। অনেক ধরনের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে তিনি এ নিয়ামাত বান্দাকে দান করেছেন। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে এসব প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়। জবানের নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত হলে অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। কোনো কিছুই জবানের বিকল্প হতে পারে না।যে ব্যাক্তি কথা বলতে পারে বা বোবা সেই একমাত্র জবানতের নিয়ামাত যে কি তা উত্তমভাবে অনুভব করতে পারে। সুবহানাল্লাহ।

মানুষের মনের ভাব, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-উল্লাস প্রকাশে জবানই বিরাট ভূমিকা পালন করে। বলতে গেলে জবানই হচ্ছে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখপাত্র। বোবার মনের কত দুঃখ-কষ্ট, কত আনন্দ-বেদনা, কিন্তু কাউকে জানাতে পারে না, জীবনের প্রতিটি ধাপে যার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

সাধারণত যার মুখে জড়তা আছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারে না তার জীবনেই তো কত সমস্যা হয় ভাব প্রকাশে। কত যে কষ্ট পেতে হয় তাকে। কত জায়গায় যে লজ্জা পেতে হয়। অথচ আমরা নির্বিচারে যত্রতত্র জবানের অপব্যবহার করে চলেছি। এই নিমায়াতের কতো ভুল প্রয়োগ করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত । আল্লহ তায়ালা ক্ষমা করুন।

বস্তুত এত বড় নিআমতের উপলব্ধি আমাদের মাঝে না থাকার কারণ হল, বিনামূল্যে কোনো কষ্ট স্বীকার ছাড়াই এ নিআমত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন।

হায়! আমরা যদি একটু বুঝতাম,কি এই নিআমত! আমাদের প্রতি রব্বে কারীমের যে এটা কত বড় দান! কখনো কথা বলার আগে ভেবেছি কি- কীভাবে কথা বলছি? এত সুন্দর আওয়াজ কীভাবে বের হয়?কোথা থেকে এ ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়? এই যে কথা বলছি এটাতে আমাদের আখিরাতে কোনো ফায়দা হচ্ছে কিনা? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কত বড় নিআমত দান করেছেন আর আমরা এটা দিয়েই তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হচ্ছি প্রতিনিয়ত। এ জবানের কত অপব্যবহার করছি প্রতিনিয়তি এর কোনো সঠিক হিসাবও নেই। কত পাপ এ যে জবান দিয়ে হচ্ছে, তার অনুভূতিটুকুও নেই আমাদের,হায়!

একটু ভেবেছি কি, কথা বলার জন্য যদি আমাদেরকে মিনিট হিসাব করে বিল পরিশোধ করতে হত, তাহলে জীবনটা কতো কঠিন হয়ে যেতো আমাদের জন্যে!!

আল্লাহ আমাদেরকে এই নিয়ামাত এমনিতেই দিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্যে এই নিয়ামাতের জন্য আমাদের অনেক বেশি শুকরিয়া আদায় করা জরুরত। অথচ আমরা কিনা নির্বিচারে জবানের প্রতি জুলুম করে যাচ্ছি। নাফরমানির কাজে ব্যবহার করছি, এ যবান দিয়ে আল্লহ তায়ালার ই বিরুদ্ধাচরণ করছি। আল্লস তায়ালা ক্ষমা করুন।

এমনকি শিরকী-কুফরী কথাও যারা বলছে এই জবানই ব্যবহার করে বলছে। বিন্দুমাত্র অনুভূতি-অনুশোচনাও নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنّ العَبْدَ لَيَتَكَلّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيّنُ فِيهَا، يَزِلّ بِهَا فِي النّارِ أَبْعَدَ مِمّا بَيْنَ المَشْرِق.ِ

অর্থাৎ বান্দা চিন্তা-ভাবনা ছাড়া এমন কথা বলে ফেলে, যার কারণে সে (পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ) জাহান্নামের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে।(-সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৭)

বহু ক্ষেত্রে জবানের অপব্যবহার এর কারণে গভীর সম্পর্কও তছনছ হয়ে যায়। হৃদয়কে জর্জরিত করে। অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত করে, যা কখনও মানুষ ভুলতে পারে না। কারণ, জবানের আঘাতের ঘা সহজে শুকায় না।

জবানের সঠিক ব্যবহার যেমন অনেক কল্যাণ বয়ে আনে তেমনি এর যত্রতত্র অপব্যবহার ধ্বংসও ডেকে আনে। এজন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জবানের ব্যবহার নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হতেন।

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: ... قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: " هَذَا."

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আসসাকাফী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ...আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমার কোন্ বিষয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি আশংকা করেন। তখন তিনি নিজ জিহ্বা ধরলেন এরপর বললেন, এটা। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫৪১৯

সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে জবানের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। পরস্পরিক কথাবার্তা, লেনদেন, আলাপ-আলোচনা, সব কিছুতেই মুখের ভূমিকা অপরিসীম। এটা সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র।

জবানের যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা দুনিয়া-আখিরাতে মানুষ যেভাবে উপকৃত হতে পারে ঠিক তেমনি এর অপব্যবহার দ্বারা ডেকে আনতে পারে ধ্বংস। এই জবানের মাধ্যমে যেমন সত্তর বছরের বৃদ্ধ ঈমানের স্বীকারোক্তি দিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি হতে পারে তেমনি কুফরের উচ্চারণের মাধ্যমে মানুষ জাহান্নামে নিক্ষেপ হতে পারে।

যার বাকশক্তি মজবুত এবং যে সুন্দর উপস্থাপনে যত দক্ষ জবানের অপব্যবহারে তার ক্ষতির আশংকাও ঠিক ততটাই বেশি। তাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের দরজায় কিছু মানুষকে বিবাদে লিপ্ত দেখে বললেন-

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبَ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا.

আমিও মানুষ। আমার কাছে (বিচার নিয়ে) বাদী-বিবাদী আসে। কখনো এমন হয় যে, তোমাদের একজনের চেয়ে অপরজন দলীল উপস্থাপনে বেশি পারঙ্গম। ফলে (দলীল উপস্থাপন থেকে) আমি কাউকে সত্যবাদী মনে করি আর (সেই ভিত্তিতে) কারো পক্ষে ফয়সালা করি। কখনো যদি এমন ঘটে- আমি অপর মুসলিমের হক কারো জন্য ফয়সালা করে দিলাম তাহলে (শুনে রাখ) তা হবে জাহান্নামের আগুনের একটি টুকরা। (এখন তার ইচ্ছা, চাইলে) সে তা গ্রহণ করুক অথবা তা থেকে নিজেকে রক্ষা করুক। (-সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৮১)

প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট ভাষা আল্লাহর মহা দান। সঠিক ও যথার্থ ব্যবহার অত্যাবশ্যক। নয়তো জাহান্নামের আগুনই হবে ঠিকানা।

সাধারণত আমাদের কথাগুলো চার রকমের হয়ে থাকে।

১. পুরো কথাই কল্যাণকর।

২. পুরো কথাই ক্ষতিকর।

৩. যে কথাতে কল্যাণ-অকল্যাণ মিশ্রিত থাকে।

৪. যে কথাতে দুনিয়া-আখেরাতের লাভ-ক্ষতি কিছুই নেই। অর্থাৎ অনর্থক কথা।

কল্যাণকর কথার ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান হল পুরোপুরি জেনেশুনে কথা বলা। অনুমান করে কথাবার্তা বলবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا.

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। জেনে রেখো, কান, চোখ হৃদয়- এর প্রতিটি সম্পর্কে (তোমাদেরকে) জিজ্ঞেস করা হবে। (-সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩৬)

আমাদের অনেকের মাঝে একটি প্রবণতা খুব বেশি লক্ষ করা যায়। আমরা যেখানে যা শুনি তাই বিশ্বাস করি এবং প্রচার করতে শুরু করি। যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজন বোধ করি না। কোনো তথ্য বা সংবাদ বর্ণনা করার আগে যাচাই-বাছাই করা অবশ্যই কর্তব্য। অন্যথায় মিথ্যা হওয়ার প্রবল আশংকা থেকেই যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

ব্যক্তি যা শুনে তা বর্ণনা করা মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। (-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪)

যাচাই-বাছাই ছাড়া কথা বলতে থাকা কিংবা সে অনুযায়ী কর্মনীতি নির্ধারণ করতে থাকা চরম বোকামী। এর পরিণাম কখনো কখনো আক্ষেপের কারণ হয়ে যায় এবং ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনে। মহান আল্লাহ বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ.

হে মুমিনগণ! কোনো ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।(-সূরা হুজুরাত (৪৯) : ৬)

আর যে কথায় কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়টাই রয়েছে, বিশেষ প্রয়োজনে তা বলা যাবে। যেমন, বললে কারো গীবত হয়, না বললে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়- এমন কথা।

ক্ষতিকর ও অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। মুমিন তো ক্ষতিকর কথা বলতেই পারে না। এসব বলে মুমিন কেন জাহান্নামে যাবে তাই না? মুমিন তো অনর্থক কথা থেকেও বেঁচে থাকে। এজন্যে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ عَنِ اللَّغۡوِ مُعۡرِضُوۡنَ.

যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। (-সূরা মুমিনূন (২৩) : ৩)

একজন বিজ্ঞজনের জবান নিয়ে উক্তি-

في اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من أحدهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت...

জবানের দুটি বিপদ। কথার বিপদ ও চুপ থাকার বিপদ! একটি থেকে মুক্তি পেলেও অপরটি থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।'

কখনো একটি আরেকটির চেয়ে বড় বিপদ হয়ে সামনে আসে। সত্য থেকে যে চুপ থাকে সেও তো অপরাধী। আর যে বাতিল কথা বলে সে আল্লাহর অবাধ্য, শয়তানের মুখপাত্র। আল্লস তায়ালা আমাদেরকে হিফাজত করুন এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে।

কথায় আছে, দামী জিনিসের হিফাযত বড়ই কঠিন। স্বর্ণ-রূপা তো মানুষ যত্রতত্র ফেলে রাখে না। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে হিফাযতের চেষ্টা করে। আল্লাহ তাআলা জবান হিফাযতের তাকীদ করেছেন এভাবে-

مَا یَلۡفِظُ مِنۡ قَوۡلٍ اِلَّا لَدَیۡهِ رَقِیۡبٌ عَتِیۡدٌ.

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (লেখার জন্য) সদা প্রস্তুত। (-সূরা ক্বফ (৫০) : ১৮)

জবানে উচ্চারিত সবকিছুই ফেরেশতাগণ সংরক্ষণ করে রাখেন। ভালো-মন্দ, ছোট-বড় সবকিছুই তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন। কিয়ামতের দিন এগুলোর হিসাব দিতে হবে। সেইদিন জিহ্বা, হাত-পাসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাক্ষী দিবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْن. َ

যেদিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে। -সূরা নূর (২৪) : ২৪

আল্লাহ তাআলা বিভিন্নভাবে বান্দাকে সতর্ক করেছেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী শুধরে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল সে মহা সাফল্য অর্জন করল। -সূরা আহযাব (৩৩) : ৭০

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে তাকওয়া অবলম্বন তথা সব ধরনের নাফরমানী ছেড়ে দিতে বলেছেন। এর সাথে সাথেই জবানের সদ্ব্যবহার তথা সত্য-সঠিক কথা বলতে বলেছেন। কেননা, জবান হল নাফরমানীর অনেক বড় হাতিয়ার। তাই তাকওয়ার সাথেই জবানে সত্য-সঠিক কথা বলতে বলেছেন। জবান ঠিক হয়ে গেলে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সংশোধন হয়ে যাবে। তাই এরপরেই সব আমল সংশোধন ও গুনাহ মাফের ঘোষণা দিয়েছেন।

দেখা যায় যারা জবানের হেফাযত করতে পারে, তারা অন্যান্য গুনাহ থেকে সহজেই বাঁচতে পারে। জবানের ব্যাপারে শিথিলতা অনেক বড় বড় বিপদ ডেকে আনে। কখনো কখধো দেখা যায়, দু-একটি কথার সূত্র ধরে বউ-শাশুড়ি কিংবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বড় ধরনের ঝগড়া-বিবাদ হয়ে যায়।

যবান হেফাযতের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন-

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.ْ

যে আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (-সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০১৮)

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবী ওকবা ইবনে আমের রা.-কে তিনটি ওসিয়ত করলেন। এর প্রথমটি ছিল-

امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَك.َ

তুমি তোমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪০৬

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

وَالّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ أَحْوَجُ إِلَى طُولِ سَجْنٍ مِنْ لِسَان.ٍ

অর্থাৎ, সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। ভূপৃষ্ঠে সবকিছুর চেয়ে জিহ্বাই সবচেয়ে বেশি বন্দিত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মুখাপেক্ষী। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, বর্ণনা ৮৭৪৪; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, বর্ণনা ১৮১৮৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচালকে অপছন্দ করতেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ

তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে দূরে থাকবে সে, যে অযথা বেশি কথা বলে এবং যে অহংকার প্রদর্শনের জন্য, দাপট দেখানোর জন্য মুখ ভরে কথা বলে।(-জামে তিরমিযী, হাদীস ২০১৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ صَمَتَ نَجَا.

যে চুপ থাকে সে বেঁচে যায়। (-জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫০১)

অন্যত্র তিনি বলেন-

إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ سَالِمًا مَا سَكَتَ، فَإِذَا تَكَلَّمتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ.

তুমি যখন চুপ থাকবে তখন নিরাপদেই থাকবে। আর যখন কথা বলবে তখন তা তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে যাবে। (-আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১৩৭)

এক দার্শনিকের অভিব্যক্তি-

ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا

আমি কখনো আমার নীরবতার উপর অনুতপ্ত হইনি। তবে বহুবার কথার কারণে লজ্জিত হয়েছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবান হিফাযতের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন-

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ.

যে তার জবান ও লজ্জাস্থান হেফাযতের যামানত দিতে পারবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব। (-সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই হচ্ছেন আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। কথা-বার্তা, চাল-চলন, কাজ-কর্ম সব বিষয়ে তিনি কখনও অযথা অনর্থক কথা বলতেন না, এমনকি বলা পছন্দও করতেন না। শুধু উপকারী ও প্রয়োজনীয় কথা বলতেন। তিনি দীর্ঘসময় নীরব থাকতেন। হাদীসে এসেছে-

كَانَ طَوِيلَ الصّمْتِ قَلِيلَ الضّحْكِ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘসময় চুপ থাকতেন এবং কম হাসতেন। (-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০৮১০)

জবানের অপব্যবহার মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। দীর্ঘ এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মুআয রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন-

وَهَلْ نُؤَاخَذُ بِمَا تَكَلَّمَتْ بِهِ أَلْسِنَتُنَا؟
কথার কারণেও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? (মুখের কথার কারণেও কি জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে?)

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ রা.-এর উরুতে মৃদু আঘাত করে বললেন-

يَا مُعَاذُ ثَكِلَتْكَ أُمّكَ - أَوْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ - وَهَلْ يكَب النّاس عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنّمَ إِلّا مَا نَطَقَتْ بِهِ أَلْسِنَتُهُم.ْ

فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ عَنْ شَرّ، قُولُوا خَيْرًا تَغْنَمُوا وَاسْكُتُوا عَنْ شَرّ تَسْلَمُوا.

হে মুআয! তুমি এ বিষয়টি বুঝ না! আরে, মানুষকে তো তার যবানের কথাই উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

যে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী সে যেন ভালো কথা বলে বা অন্তত মন্দ কথা থেকে বিরত থাকে। তোমরা ভালো কথা বল, লাভবান হবে। মন্দকাজ থেকে বিরত থাক, নিরাপদ থাকবে। (-মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৭৭৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। কত পবিত্র ছিল তাঁর জবান! সুবহানাল্লহ!

যে যবান আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার কাছে ওহী পৌঁছায় এবং আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা দান করে। এ যবানের পবিত্রতা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন-

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى، اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

[সে তার নিজ খেয়াল-খুশি থেকে কিছু বলে না। এ তো ওহী, যা তার কাছে পাঠানো হয়। -সূরা আননাজম (৫৩) : ৩-৪] তা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয়কাতর হয়ে আল্লাহর কাছে জবানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন-

اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرّ مَنِيّي.

হে আল্লাহ! আমি আমার কান, চোখ, যবান, হৃদয় এবং লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই।(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৫১; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৯২)

আমাদের উচিত জবানের সঠিক ব্যবহারের প্রতি আরোও সচেতন ও যত্নবান হওয়া এবং এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

গীবত

বর্তমানে গীবত খুবই স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে অথচ কুরআনুল কারীমে গীবত করতে আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। মানুষ যাতে গীবতকে ঘৃণা করে এবং তাতে নিরুৎসাহ হয় সেজন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাদেশ করেছেন। আল্লহ তায়ালা গীবতকে এমন

ঘৃণ্যভাবে আমাদের কাছে চিত্রিত করেছেন যাতে যেকোনো মনই তার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠবে। তিনি বলেছেন,

﴿وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ﴾ [الحجرات: ١٢]

"তোমরা একে অপরের যেন গীবত না কর। তোমাদের কেউ কি স্বীয় মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ পছন্দ করে? অনন্তর তোমরা তা অপছন্দ কর"। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২]

'গীবত' কি এই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

«أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»

"তোমরা কি জান 'গীবত' কী? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তোমার ভাই যে কথা অপছন্দ করে তার সম্পর্কে সে কথা বলার নাম গীবত। জিজ্ঞেস করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবেই তুমি তার 'গীবত' করলে। আর যদি না থাকে তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে"।[সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৮২৮।]

সুতরাং আমরা এর মাধ্যমে বুঝতে পারছি, মানুষের মধ্যে যে দোষ আছে এবং যার চর্চা সে অপছন্দ করে তা আলোচনা করাই হলো গীবত। সে দোষ তার শরীর সংক্রান্ত হোক কিংবা দ্বীন ও চরিত্র বিষয়ক হোক কিংবা আকার-আকৃতি বিষয়ক হোক। গীবত করার ধরণও নানা রকম রয়েছে। যেমন, ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তার কর্মকাণ্ড তুলে ধরা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলর কাছে গীবত খুবই নিকৃষ্ট ও খারাপ কাজ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ গীবতের ব্যাপারে খুবই উদাসীনতা দেখিয়ে থাকে। এজন্য গীবতের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»

"সূদের (পাপের) ৭৩টি দরজা বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নতম স্তর হচ্ছে স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া তুল্য পাপ এবং ঊর্ধ্বতম স্তর হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার এক ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের হানি ঘটানোতুল্য পাপ"।[ত্বাবরাণী; সিলসিলা সহীহুল হাদীস নং ১৮৭১।]

যে মজলিসে কারও গীবত করা হয় সেখানে যে ব্যক্তিই উপস্থিত থাকুক তাকে তা নিষেধ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যে ভাইয়ের গীবত করা হয় তার পক্ষ নিয়ে সাধ্যমত তাকে সহযোগিতা করাও আবশ্যক। সম্ভব হলে ঐ মজলিসেই গীবতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ»

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে কৃত হামলাকে প্রতিহত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার থেকে জাহান্নামের আগুনকে প্রতিহত করবেন”।
[মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৭৫৮৩; তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৩১]

চোগলখরী

মানুষের মাঝে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর চিন্তা করে একজনের কথা অন্য জনের কাছে লাগানোকে চোগলখুরী বলে। চোগলখুরীর ফলে মানুষের সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি হয় । চোগলখুরীর নিন্দায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ١٠ هَمَّازٖ مَّشَّآءِۢ بِنَمِيمٖ ١١﴾ [القلم: ١٠، ١١]

“যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অন্যের নিকটে লাগায় আপনি তার আনুগত্য করবেন না”। [সূরা আল-ক্বালাম, আয়াত: ১০-১১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ»

“চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না”। (সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৮২৩)

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মদীনার একটি খেজুর বাগান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তথায় তিনি দু’জন লোকের আহাজারী শুনতে পেলেন। তখন তাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»

“এ দু’জনকে ‘আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো কারণে নয়। অবশ্য এগুলো কবীরা গুনাহ। তাদের একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না। অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াত”।[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৫৫; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৬০৭৫।]

চোগলখুরীর পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নিকৃষ্ট পদ্ধতি হলো, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীকে ক্ষেপিয়ে তুলে তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরানো। অনুরূপভাবে অনেক কর্মজীবি অফিসের বস কিংবা দায়িত্বশীলের নিকট অন্য কোনো কর্মজীবির কথা তুলে ধরে। এতে তার উদ্দেশ্য উক্ত কর্মজীবির ক্ষতি সাধন করা এবং নিজেকে উক্ত দায়িত্বশীলের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে তুলে ধরা। এসব কাজ চোগলখুরী হিসাবে গণ্য এবং তা হারাম।

মিথ্যা কথা

মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া একটি মারাত্মক অপরাধ।কবীরা গুনাহ।

কোন বিষয়ে নিশ্চিত জানাশোনা না থাকা সত্ত্বেও সে বিষয়ে অনুমান ভিত্তিক কোন কথা বলা গুনাহ এবং তা অধিকাংশ সময় মিথ্যা হতেই বাধ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَآئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوْلًا»

"যে বিষয়ে তোমার পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পেছনে পড়ো না তথা অনুমানের ভিত্তিতে কখনো পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয়ই তুমি কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় এ সবের ব্যাপারে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে"।

(ইস্রা'/বানী ইস্রাঈল : ৩৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

«قُتِلَ الْـخَرَّاصُوْنَ»

"(অনুমান ভিত্তিক) মিথ্যাচারীরা ধ্বংস হোক"। (যারিয়াত : ১০)

মিথ্যুক আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত পাওয়ার উপযুক্ত।

মুবাহালার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ»

"অতঃপর আমরা সবাই (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) এ মর্মে প্রার্থনা করি যে, মিথ্যুকদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত পতিত হোক"।

(আ'লি 'ইমরান : ৬১)

মুলা'আনার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«وَالْـخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ»

"পঞ্চমবার পুরুষ এ কথা বলবে যে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত পতিত হোক যদি সে (নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে"।

(নূর : ৭)

মিথ্যা কখনো কখনো মিথ্যাবাদীকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় এবং মিথ্যা বলতে বলতে পরিশেষে সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মিথ্যুক হিসেবেই পরিগণিত হয়।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْـجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

"তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে এবং সর্বদা সত্যের অনুসন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্

তা'আলার নিকট সত্যবাদী হিসেবেই লিখিত হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো। কারণ, মিথ্যা পাপাচারের রাস্তা দেখায় আর পাপাচার জাহান্নামের রাস্তা। কোন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং সর্বদা মিথ্যার অনুসন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মিথ্যাবাদী রূপেই লিখিত হয়"।

(মুসলিম ২৬০৭)

সামুরাহ্ বিন্ জুন্দুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে নিজ স্বপ্ন বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: গত রাত আমার নিকট দু' জন ব্যক্তি এসেছে। তারা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললো: চলুন, তখন আমি তাদের সাথেই রওয়ানা করলাম। যেতে যেতে আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছুলাম যে চিত হয়ে শায়িত। অন্য আরেক জন তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি মাথা বাঁকানো লোহা হাতে। লোকটি বাঁকানো লোহা দিয়ে শায়িত ব্যক্তির একটি গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখ ঘাড় পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলছে। এরপর সে উক্ত ব্যক্তির অন্য গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখটিকেও এমনিভাবে ছিঁড়ে ফেলছে। লোকটি শায়িত ব্যক্তির এক পার্শ্ব ছিঁড়তে না ছিঁড়তেই তার অন্য পার্শ্ব পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে এবং লোকটি শায়িত ব্যক্তিটির সাথে সে ব্যবহারই করছে যা পূর্বে করেছে। ফিরিশ্তাদ্বয় উক্ত ঘটনার ব্যাখ্যায় বলেন: উক্ত ব্যক্তির দোষ এই যে, সে ভোর বেলায় ঘর থেকে বের হয়েই মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় যা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে"। (বুখারী ৭০৪৭; মুসলিম ২২৭৫)

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, অনেক রসিক ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষকে হাসানোর জন্যই মিথ্যা কথা বলে থাকেন। তাতে তার দুনিয়াবী অন্য কোন ফায়েদা নেই। অথচ সে অন্যকে ফুর্তি দেয়ার জন্যই এমন জঘন্য কাজ করে থাকে।

'হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ.

"অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির যে মানুষকে হাসানোর জন্যই মিথ্যা কথা বলে। অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির; অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির"।

(তিরমিযী ২৩১৫)

বর্তমানে অনেকের মধ্যে মিথ্যা স্বপ্ন তথা স্বপ্ন বানিয়ে বলার প্রবণতা রয়েছে।এটিও মিথ্যারই অন্তর্ভুক্ত।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আববাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ، وَلَنْ يَّفْعَلَ.

"যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখেছে বলে দাবি করলো অথচ সে তা দেখেনি তা হলে তাকে দু'টি যব একত্রে জোড়া দিতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তা কখনোই করতে পারবে না"।

(বুখারী ৭০৪২; তিরমিযী ২২৮৩)
'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ.

"সর্ব নিকৃষ্ট মিথ্যা এই যে, কেউ যা স্বপ্নে দেখেনি তা সে দেখেছে বলে দাবি করছে"। (বুখারী ৭০৪৩)

তবে যদি অতি প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের কল্যাণ অর্জনের জন্য অথবা নিশ্চিত কোন অঘটন থেকে বাঁচার জন্য; কেননা সে অবস্থায় সত্য বললে কোনভাবেই হবে না এবং তাতে কারোর কোন অধিকারও বিনষ্ট করা হয় না অথবা কোন হারামকেও হালাল করা হয় না ,তাহলে এমতাবস্থায় মিথ্যা বলা জায়িয আছে। তবুও এমতাবস্থায় এমনভাবে মিথ্যাটিকে উপস্থাপন করা উচিৎ যাতে বাহ্যিকভাকে তা মিথ্যা মনে হলেও আসলে বাস্তবে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। কারণ, কথাটি বলার সময় তার মনে সত্য দিকটি প্রকাশ ছিলো। আরবী ভাষায় যা তাওরিয়া বা মা'আরীয নামে পরিচিত।

'ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ فِيْ الْـمَعَارِيْضِ لَـمَنْدُوْحَةً عَنِ الْكَذِبِ.

"ঘুরিয়ে কথা বললে জাজ্বল্য মিথ্যা বলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়"।
(বায়হাক্বী ১০/১৯৯ ইব্নু 'আদী ৩/৯৬)

উম্মে কুল্সূম বিন্তে 'উক্ববাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِيْ خَيْرًا.

"সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা করে এবং সে উক্ত উদ্দেশ্যেই ভালো কথা বলে এবং তা বানিয়ে বলে"।
(বুখারী ২৬৯২; মুসলিম ২৬০৫)

উম্মে কুলসুম বিন্তে 'উক্কবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র তিনটি বিষয়েই মিথ্যা বলার সুযোগ দিয়েছেন।
রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا : الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُوْلُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيْدُ بِهِ إِلاَّ الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُوْلُ فِيْ الْـحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ اِمْرَأَتَهُ، وَالْـمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا.

"আমি মিথ্যা মনে করি না যে, কোন ব্যক্তি মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসার জন্য কোন কথা বানিয়ে বলবে। তার উদ্দেশ্য কেবল বিরোধ মীমাংসাই। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি শত্রু

পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার জন্য কোন কথা বানিয়ে বলবে। তেমনিভাবে কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে এবং কোন মহিলা নিজ স্বামীর সঙ্গে কোন কথা বানিয়ে বলবে''।
(আবূ দাউদ ৪৯২১)

ইবনু শিহাব যুহরী বলেন: ''আমার শুনাজানা মতে তিন জায়গায়ই মিথ্যা কথা বলা যায়। আর তা হচ্ছে যুদ্ধ, মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর কথা।''
মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানও কবীরা গুনাহ্গুলোর অন্যতম।
আল্লাহ্ তায়া'লার খাঁটি বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

»وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ«

''আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না''। (ফুরকান : ৭২)

গালি দেওয়া

কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গালি-গালাজ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। গালি দেয়া অন্তরের রোগ গুলোর মধ্যে অন্যতম।
ইবনে উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তোমাকে তোমার সে বিষয় নিয়ে গালি দেয় যা সে জানে, তখন তুমি সেই ব্যক্তিকে সেই বিষয় ধরে গালি দিয়ো না, যা তুমি ওর মধ্যে আছে তা জান। এতে তোমার পূণ্য লাভ হবে এবং ওর উপর হবে পাপের বোঝা।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ ﷺ إِذَا سَبَّكَ رَجُلٌ بِمَا يَعْلَمُ مِنْكَ فلا تَسُبَّهُ بِما تَعْلَمُ مِنْهُ فَيَكُونَ أَجْرُ ذٰلِكَ لَكَ وَوَبالُـهُ عَلَيْهِ

(সহীহুল জামে' ৫৯৪)
জাবের বিন সুলাইম হুজাইমী (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ...আর যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় এবং যে ত্রুটি তোমার মধ্যে নেই তা নিয়ে তোমাকে লজ্জা দেয়, তাহলে তুমি তাকে সেই ত্রুটি নিয়ে ওকে লজ্জা দিয়ো না, যা ওর মধ্যে আছে। ওকে উপেক্ষা করে চল। ওর পাপ ওর উপর এবং তোমার পুণ্য তোমার জন্য। আর অবশ্যই কাউকে গালি দিয়ো না।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَلِيْمِ الْهَجَيْمِيْ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: وإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وعَيَّرَكَ بِأَمْرٍ لَيْسَ هُوَ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِأَمْرٍ هُوَ فِيهِ ودَعْهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَلَيْه وأَجْرُهُ لَكَ ولا تَسُبَّنَّ أَحَداً

(ইবনে হিব্বান ৫২১, ত্বায়ালিসী ১২০৮, সহীহুল জামে' ৯৮)

রিয়া

রিয়া (الرياء) অর্থ হচ্ছে প্রদর্শন করা বা প্রদর্শন করার ইচ্ছা। আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত পালনের মধ্যে মানুষকে দেখানো, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকেই রিয়া বলে।

মুমিনের ইবাদত ধ্বংস করে তাকে জাহান্নামী বানানোর জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদের নাম হচ্ছে 'রিয়া'। কুরআন-হাদীসে রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসগ্রস্ত হয়।[মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫১৩-১৫১৪ (কিতাবুল ইমারাহ, বাবু মান কাতালা লিররিয়া)]

বিভিন্ন হাদীসে রিয়াকে 'শিরক আসগার' বা ছোট শিরক এবং 'শিরক খাফী' বা লুক্কায়িত শিরক বলা হয়েছে। কারণ বান্দা আল্লাহর জন্য ইবাদত করলেও রিয়ার মাধ্যমে অন্য সৃষ্টি থেকে সামান্য 'কিছু' আশা করার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। এ শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হয় না কিন্তু তার ইবাদত ধ্বংস ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। মাহমূদ ইবন লাবীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

"আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হলো শিরক আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, শিরক আসগার কী? তিনি বলেন: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের পুরস্কার পাও কি না!"[আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৪২৮-৪২৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০২। হাদীসটি সহীহ।]

এক হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

"দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন শির্ক। গোপন শির্ক এই যে, একজন সালাতে দাঁড়াবে এরপর যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে।"[ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৪০৬ (কিতাবুয যুহদ, বাবুর রিয়া ওয়াস সুমআখ); আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৮৯। হাদীসটি হাসান।]

কোরআনে কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মতো, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মতো, যার ওপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর ওপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ওই বস্তুর কোনো সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।' (সুরা বাকারা : ২৬৪)

আরেক জায়গায় এসেছে, 'অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সঙ্গে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুত তারা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।' (সুরা নিসা : ১৪২)

রাসুল (সা.) বলেছেন হাদিসে রিয়াকে ছোট শিরক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি ছোট শিরক তথা রিয়ার ব্যাপারে।' (ফাতহুল গফফার : ০৪/২১০৪)

হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, 'আমি অংশীবাদিতা (শিরক) থেকে সকল অংশীদারের তুলনায় বেশি মুখাপেক্ষীহীন। যে কেউ কোনো আমল করে এবং তাতে অন্য কাউকে আমার সঙ্গে শরিক করে, আমি তাকে ও তার আমল উভয়কেই বর্জন করি। (মুসলিম : ২৯৮৫)

তাই রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুমিনের চেষ্টা করতে হবে যথাসম্ভব সকল নফল ইবাদত গোপনে করা। তবে যে ইবাদত প্রকাশ্যে করাই সুন্নাত-সম্মত তা প্রকাশ্যেই করতে হবে। রিয়ার ভয়ে কোনো নিয়মিত ইবাদত বা প্রকাশ্যে করণীয় ইবাদত বাদ দেওয়া যাবে না। রিয়ার অনুভূতি মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করতে হবে। কখনো এসে গেলে বারবার তাওবা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে রিয়া থেকে বাঁচার তাওফীক প্রার্থনা করতে হবে।

রিয়া থেকে বাঁচার জন্যে আমরা হাদিসে শেখানো দোয়া করতে পারি:

আবু মুসা বলেন, "একদিন আল্লাহর রাসূল (সা) এক ভাষণে বললেন, 'হে লোকসকল! শিরককে ভয় করো। কারণ, এটি পিঁপড়ার চুপিসারে চলার চেয়েও গুপ্ত।' তারা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কীভাবে এ থেকে বেঁচে থাকব— যদি তা পিঁপড়ার চলার চেয়েও গুপ্ত হয়?' তিনি বললেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত, তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই। (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ৭১৬)

লোভ

লোভ অন্তরের রোগগুলোর মধ্যে অন্যতম। লোভে পড়ে মানুষ নিজের ঈমান-আমল-আখলাক সবই খুইয়ে বসে। দুনিয়ার সব সম্পদ,যশ খ্যাতি ভোগ করাই সব কিছু না। এসব ক্ষণস্থায়ী। এই দুনিয়ায় আমরা যা- ই কামাই করি না কেন তা পাওয়ার ক্ষমতাও আমাদের নেই আর তা আল্লহ তায়ালা যদি রিজিকে না রাখেন তবে ভোগ করার ক্ষমতাও আমাদের নেই।

আমাদের বুঝতে হবে যে, দুনিয়ায় কোনো মানুষই নিজে কামাই করতে বা ভোগ করতে পারে না। মানুষ প্রশংসা বা সম্মান করলেও আমার কিছুই লাভ হবে না। আমার পালনকর্তার পুরস্কারই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি অল্পতেই খুশি হন ও বেশি পুরস্কার দেন। তিনি দিলে কেউ ঠেকাতে পারে না। আর তিনি না দিলে কেউ দিতে পারে না।

কা’ব ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِه

“দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একটি মেষপালের মধ্যে ছেড়ে দিলে নেকড়েদুটি মেশপালের যে ক্ষতি করে, সম্পদ ও সম্মানের লোভ মানুষের দীনের তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে।”[তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৮৮ (কিতাবুয যুহদ, বাব ৪৩)। হাদীসটি হাসান-সহীহ।]

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ لابنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يكُونَ لَهُ وَادِيانِ وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ مُتَّفَقٌ عليه

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদম সন্তানের মালিকানায় যদি সোনার একটি উপত্যকাও হয়, তবুও সে অনুরূপ আরো একটির মালিক হওয়ার অভিলাষী থাকবে। পরন্তুএকমাত্র মাটিই আদম সন্তানের চোখ (পেট) পূর্ণ করতে পারে। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন।

(বুখারী ৬৪৩৭, মুসলিম ২৪৬২)

وَعَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

কা’ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোন ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলের যতটা বিনাশ সাধন করে তার চাইতেও ধনলোভ ও খ্যাতিলোভ মানুষের দ্বীনের অধিক বিনাশ সাধন করে।

(তিরমিযী ২৩৭৬, ইবনে হিব্বান ৩২১৮, সহীহুল জামে’ ৫৬২০)

عَنْ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বৃদ্ধের অন্তর দু'টি জিনিসের ব্যাপারে সব সময় যুবকই থাকে; দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে।(বুখারী ৬৪২০)

عَنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي النَّاسَ عَطَايَاهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ أَلْف دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ: خُذْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) লোকেদেরকে তাদের প্রাপ্য দান করতেন। একদা এক ব্যক্তি এলে তাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বললেন, নাও। আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে দীনার ও দিরহাম ধ্বংস করেছে। আর সেই দু'টি তোমাদেরকেও ধ্বংস করবে।(বাযযার, সহীহ তারগীব ৩২৫৮)

وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ إِلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا أَلاَ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا قَالَ : فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ متفق عَلَيْهِ

وفي رواية وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ عُقْبَةُ : فَكَانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ

وفي روايةٍ قَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

উক্কবাহ ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) উহুদের শহীদদের (কবরস্থানের) দিকে বের হলেন এবং যেন জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদেরকে বিদায় জানাবার উদ্দেশ্যে আট বছর পর তাঁদের উপর জানাযা পড়লেন (অর্থাৎ তাঁদের জন্য দু'আ করলেন)। তারপর মিম্বরে চড়ে বললেন, আমি পূর্বে গমনকারী তোমাদের জন্য সুব্যবস্থাপক এবং সাক্ষীও। তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হওযে (কাউসার)। আমি অবশ্যই ওটাকে আমার এই স্থান থেকে দেখতে পাচ্ছি। শোনো! তোমাদের ব্যাপারে আমার এ আশংকা নেই যে, তোমরা শিরক করবে। তবে তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। (রাবী বলেন,) 'এটাই আমার শেষ দৃষ্টি ছিল যা আমি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি নিবদ্ধ করেছিলাম (অর্থাৎ, এরপর তিনি দেহত্যাগ করেন)।' (বুখারী ৪০৪২, মুসলিম ৬১১৭)

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কিন্তু তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সে জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং (পরিণামে) তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে। উক্বা (রাঃ) বলেন, 'মিম্বরের উপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এটাই ছিল আমার শেষ দর্শন।'

অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি তোমাদের অগ্রদূত এবং তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহর শপথ! আমি এই মুহূর্তে আমার হওয (হওযে কাওসার) দেখছি। আমাকে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি তোমাদের ব্যাপারে এ জন্য শংকিত নই যে, তোমরা আমার (তিরোধানের) পর শিরক করবে; বরং এ আশংকা বোধ করছি যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদের ব্যাপারে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।
হাদীসে উল্লিখিত 'শহীদদের উপর জানাযা পড়লেন' অর্থাৎ, তাঁদের জন্য দু'আ করলেন। (তকবীর সহ) পরিচিত জানাযার নামায নয়।

কুচিন্তা , কুধারণা

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূল (ﷺ) বলেছেন- বনী আদমের অন্তরে ফেরেশতার পক্ষ হতে ইলহাম হয়। শয়তানও বনী আদমের অন্তরে কুমন্ত্রনা ঢেলে দেয়। ফিরিস্তা তার সাথে কল্যাণের ওয়াদা করে, সত্যের সত্যায়ন করে এবং অন্তরে ভাল কাজের বিনিময়ে ছাওয়াবের আশা-আকাঙ্খা জাগ্রত করে। শয়তানের কুমন্ত্রনা হচ্ছে অন্যায় কাজের ওয়াদা করা, সত্যকে অস্বীকার করা এবং কল্যাণ অর্জন থেকে নিরাশ করা। সুতরাং তোমরা যখন অন্তরে ফিরিস্তার ইলহাম অনুভব কর তখন আল্লাহর প্রশংসা কর এবং আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা কর।
আর যখন শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনুভব কর তখন আল্লাহর কাছে শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।[এই হাদীসটি সহীহ নয়। ইমাম আলবানী রহঃ) মিশকাতুল মাসাবীহ। তাহকীক আলবানী, হা/৭৪। হাঁ বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। তাই আমল করা উচিত। কিন্তু হাদীছ মনে করে নয়। বরং উপদেশ মূলক বাণী হিসাবে।]

উছমান বিন আবুল আস নাবী (ﷺ) কে বললেন- আমার মাঝে এবং আমার সলাত ও কিরাআতের মাঝে শয়তান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

নাবী (ﷺ) তখন বললেন- এই শয়তানের নাম হচ্ছে খিনযাব। যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ কর।[সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাম।]

সাহাবীগণ নাবী (ﷺ) এর কাছে অভিযোগ করলেন যে, তাদের অন্তরে এমন জিনিসের উদয় হয়, যা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে তার কাছে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া অধিক প্রিয় বলে মনে হয়। নাবী (ﷺ) তখন বললেন- আল্লাহু আকবার। ঐ আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি শয়তানের চক্রান্তকে ওয়াসওয়াসার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। যার কাছে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে ওয়াস্ওয়াসা এবং একের পর এক যদি এভাবে প্রশ্নের উদয় হয় যে, এই তো আল্লাহ্ সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তাহলে কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে? এমন পরিস্থিতিতে তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করার আদেশ দিয়েছেনঃ

هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“তিনিই সর্বপ্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত”। (সূরা হাদীদ-৫৭:৩) এমনিভাবে আবু যামীল ইবনে আববাস (রাঃ) কে প্রশ্ন করেছিল, এ কি জিনিস যা আমার বক্ষদেশে কিছু (ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রনা) অনুভব করছি। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রাঃ) বললেন- সেটি কী? তিনি বলেন- আমি বললামঃ আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যাপারে কথা বলবনা। ইবনে আববাস তখন বললেন- সেটি কি কোন সন্দেহ? আমি বললামঃ হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা‘আলা এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল না করা পর্যন্ত কেউ এ থেকে রেহাই পায়নি। সুতরাং তুমি যখন তোমার অন্তরে এমন কিছু অনুভব কর তখন এই আয়াতটি পাঠ করবেঃ

الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“তিনিই সর্বপ্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত”। (সূরা হাদীদ-৫৭:৩) এই আয়াতের মাধ্যমে নাবী (ﷺ) মুসলিমদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, স্বচ্ছ বিবেক তাসালসুল তথা আদি-অন্তহীন সৃষ্টির অসিত্মত্বকে বাতিল সাব্যস্ত করে। সৃষ্টির প্রারম্ভ এমন এক প্রথম সত্তা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়, যার পূর্বে আর কোন সৃষ্টি নেই। এমনিভাবে এমন এক শেষ সত্তা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়, যার পরে আর কোন সৃষ্টি

নেই। অর্থাৎ যখন কোন মাখলুকের (সৃষ্টির) অসিত্মত্ব ছিল না তখন আল্লাহ্ ছিলেন আবার যখন কোন কিছুই থাকবেনা, সব কিছুই ধ্বংস হবে তখনও একমাত্র আল্লাহই অবশিষ্ট থাকবেন। তিনিই 'যাহের' এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহর উপরে অন্য কোন বস্ত্ত বা সৃষ্টি নেই। তিনি জ্ঞান ও শক্তির মাধ্যমে উর্ধ্ব জগতের সবকিছু বেষ্টন করে আছেন। আর তিনিই বাতেন, এ কথার তাৎপর্য হচেছ তিনি নিম্নজগতের সকল মাখলুককে (সৃষ্টিকে) এমনভাবে বেষ্টন করে আছেন, যার বাইরে অন্য কিছু নেই। এক কথায় ظاهر বলতে উর্ধ্বজগতের (আসমান ও তার মধ্যকার) সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর কর্তৃত্বকে বুঝানো হয়েছে আর باطن বলতে নিম্নজগতের (যমীন ও তার মধ্যকার) সকল বস্ত্তর উপর তাঁর কর্তৃত্বকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর পূর্বে যদি কোন বস্ত্ত থাকত, তাহলে তা স্রষ্টার উপর প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে যেত এবং সেই বস্ত্তই হত মহান সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক।

সুতরাং তিনিই সর্বপ্রথম, যার পূর্বে আর কেউ নেই, তিনিই শেষ, যার পরে আর কেউ নেই। সৃষ্টির ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিকাশ এমন এক সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত গিয়ে অবশ্যই শেষ হবে, যিনি অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু সবকিছুই তাঁর দিকে মুখাপেক্ষী, যিনি স্বনির্ভর, সকল বস্ত্ত তাঁর উপর নির্ভরকারী, তিনি নিজেই অসত্মীত্বশীল, কিন্তু অন্যসব বস্ত্ত তাঁর কারণেই অসত্মীত্বশীল। তিনি আদি থেকেই আছেন এবং তাঁর কোন শুরু নেই। তিনি ব্যতীত বাকী সবই অসত্মীত্বহীন থেকে অসত্মীত্বে এসেছে। তাঁর সত্তা স্থায়ী থাকবে এবং প্রত্যেক বস্ত্তর স্থায়িত্ব তাঁর কারণেই। সুতরাং তিনিই প্রথম, তাঁর পূর্বে আর কেউ নেই। তিনিই শেষ, তাঁর পরে আর কেউ নেই। তিনিই সবার উপরে, তাঁর উপরে আর কেউ নেই। তিনি আকাশের উপর আরশে সমুন্নত। তিনিই সকলের নিকটে, তার চেয়ে অধিক নিকটে আর কেউ নেই।

নাবী (ﷺ) বলেন- লোকেরা পরস্পর জিজ্ঞেস করতে থাকবে। এক পর্যায়ে তাদের কেউ বলবে, এই তো আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

তাহলে আল্লাহ্কে সৃষ্টি করেছে কে? যে ব্যক্তির হৃদয়ে এ ধরণের প্রশ্নের উদয় হবে, সে যেন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এ ধরণের কিছু চিন্তা করা হতে থেমে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তুমি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব কর, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা হা-মীম সাজদাহ-৪১: ৩৬)

কুধারণা অন্তরের রোগের মধ্যে অন্যতম একটি রোগ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا شَيْئًا مَا نُحِبُّ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ وَإِنَّ لَنَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، قَالَ: أَوَ قَدْ وَجَدْتُمْ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মনের মধ্যে এমন কিছু চিন্তার উদ্রেক হয় যা সূর্য উদিত হওয়ার পরিধির মধ্যকার (মূল্যবান) সবকিছুর বিনিময়েও কথায় প্রকাশ করা আমরা মোটেও সমীচীন মনে করি না। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তোমরা কি তা অনুভব করো? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেনঃ এটিই ঈমানের সুস্পষ্ট পরিচয়। (মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান)

وَعَنْ جَرِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِي عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَنَا يَعْرُضُ فِي صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ، وَلَوْ ظَهَرَ لَقُتِلَ بِهِ، قَالَ: فَكَبَّرَتْ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لَنْ يُحِسَّ ذَلِكَ إِلا مُؤْمِنٌ.

শাহর ইবনে হাওশাব (রহঃ) বলেন, আমি ও আমার মামা আয়শা (রাঃ)-র নিকট উপস্থিত হলাম। মামা বলেন, আমাদের কারো মনের মধ্যে এমন কিছুর উদ্রেক হয়, সে তা ব্যক্ত করলে তার আখেরাত ধ্বংস হয়ে যায় এবং তা প্রকাশ পেলে সেজন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। রাবী বলেন, আয়েশা (রাঃ) তিনবার "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি করার পর বলেন, এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কারো অন্তরে তা অনুভব করলে সে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। মুমিন ব্যক্তিই এটা অনুভব করে থাকে।

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ السَّكُونِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ سَعِيدُ بْنُ مَرْزُبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، حَتَّى يَقُولُوا: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ.

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যা হয়নি সে সম্পর্কে লোকে অনবরত জিজ্ঞেস করতে থাকবে। শেষে সে বলবে, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ। তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? (বুখারী, মুসলিম)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

يَا فُلاَنُ، إِنَّ هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةُ، قَالَ: مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ، قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীর সাথে ছিলেন। তখন তাঁর নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বলেনঃ হে অমুক! ইনি আমার স্ত্রী অমুক। সে বললো, আমি হয়তো কারো সম্পর্কে ধারণা-অনুমান করতে পারি, কিন্তু আপনার সম্পর্কে কখনো ধারণা-অনুমানে লিপ্ত হই না। তিনি বলেনঃ শয়তান রক্তপ্রবাহের মত মানুষের ভেতরে বিচরণ করে। (আবু দাউদ)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ধারণা-অনুমান সম্পর্কে তোমরা সাবধান হও। কারণ অলীক ধারণা পোষণ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা পরস্পর গোয়েন্দাগিরি করো না, ঝগড়া-বিবাদ করোনা, অসাক্ষাতে (কারো পিছনে) দোষ চর্চা করোনা, হিংসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করোনা। আল্লাহর বান্দাগণ! সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, ইবনে হিব্বান)

নফসের গোলামি

মুমিন বিশ্বাস করে যে, তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের সফলতা নির্ভর করে তার ‘নাফস’ তথা স্বীয় মনকে সংশোধন, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার পরিধির উপর; যেমনিভাবে তার জীবনের ব্যর্থতা নিশ্চিত হয় তার মনের ভ্রষ্টতা, নিষ্ক্রিয়তা, কলুষতা, অবিত্রতা ও অশুদ্ধতার কারণে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

“সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।”[সূরা আশ-শামছ, আয়াত: ৯ - ১০]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبۡوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلۡجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلۡخِيَاطِۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٤٠ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٞ وَمِن فَوۡقِهِمۡ غَوَاشٖۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي

ٱلظَّٰلِمِينَ ٤١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٤٢ ﴾ [الاعراف[٤٠، ٤٢ :

"নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তা সম্বন্ধে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না- যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আর এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব। তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও; আর এভাবেই আমরা যালিমদেরকে প্রতিফল দেব। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে- আমরা কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দেই না- তারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"[সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৪০ - ৪২]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣ ﴾ [العصر[١، ٣ :

"সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মাঝে নিপতিত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে হকের এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যের।"[সূরা আল-আসর, আয়াত: ১ - ৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أبَى . قَالُوا : وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُول الله ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى » . (رواه البخاري).

"আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে, সে ব্যতীত; তারা প্রশ্ন করল: হে আল্লাহ রাসূল! কে অস্বীকার করবে? জবাবে তিনি বললেন: যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যে আমার অবাধ্য হবে, সেই মূলত অস্বীকারকারী।"[বুখারী, হাদিস নং- ৬৮৫১]

তিনি আরও বলেন:

« كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا » . (رواه مسلم).

"প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে নিজেকে বিক্রি করে দেয়; তারপর সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।"[মুসলিম, হাদিস নং- ৫৫৬]

তেমনিভাবে মু'মিন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, যার উপর ভিত্তি করে আত্মা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হবে, তা হলো ঈমানের সৌন্দর্য ও সৎকাজ; আর যার কারণে আত্মা কলুষিত, অপবিত্র ও ধ্বংস হবে, তা হলো কুফরী ও অবাধ্যতার মত খারাপ কাজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ

"আর আপনি সালাত কায়েম করুন দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। নিশ্চয় সৎকাজ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়।"[সূরা হুদ, আয়াত: ১১৪]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

بَلۡۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

"বরং তারা যা অর্জন করেছে, তা-ই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়েছে।"[সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন, আয়াত: ১৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذنباً كَانَ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْتَبَ ، صُقِلَ قَلْبُهُ ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلَقَ قَلْبَهُ » . (رواه النسائي و الترمذي و أحمد).

"নিশ্চয় মুমিন বান্দা যখন একটি গুনাহ করে, তখন তার অন্তরের মধ্যে তা একটি কালো দাগ সৃষ্টি করে; তারপর যদি সে তাওবা করে, গুনাহ থেকে দূরে থাকে এবং অনুতপ্ত হয়, তাহলে তার অন্তরকে চকচকে পরিষ্কার করে দেয়া হয়; আর যদি গুনাহর সংখ্যা বাড়তে থাকে, তাহলে (অন্তরের মধ্যে) কালো দাগের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তা তার অন্তরকে ঢেকে ফেলবে।"[নাসায়ী ও তিরমিযী এবং হাদিসটি 'হাসান সহীহ; আর আহমাদ রহ. হাদিসটি প্রায় একই রকম অর্থে কিছু শাব্দিক হেরফেরসহ হাদিসটি তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং- ৭৯৫২]

এটাই হলো অন্তরে মরিচা বা জং ধরা,

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

كَلَّاۖ بَلۡۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

"কখনো নয়; বরং তারা যা অর্জন করেছে তা-ই তাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরিয়েছে।"[সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন, আয়াত: ১৪]

তিনি আরও বলেন:

»اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » . (رواه أحمد و الترمذي و الحاكم.(

"তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর; আর অসৎকাজ করলে তার পরপরই সৎকাজ কর, তাহলে তা মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে; আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর।

মু'মিনের সর্বক্ষণের কাজ হবে তার 'নাফস' তথা আত্মার সংশোধন, পরিশুদ্ধকরণ ও পবিত্রকরণে ফিকির করা। কারণ, ঐ ব্যক্তির আত্মাই উত্তম, যে আদব রক্ষা করে চলে; সুতরাং সে তার নাফসের জন্য এমন কতগুলো আদব রক্ষা করবে, যা তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তার ময়লাসমূহকে দূর করে তাকে পবিত্র করবে; অনুরূপভাবে তাকে দূরে রাখবে খারাপ আকিদা-বিশ্বাস এবং মন্দ কথা ও কাজের মত এমন সব বিষয় থেকে, যা তাকে কলুষিত ও নষ্ট করে দেয়; আর সে তার উন্নতির জন্য রাতদিন চেষ্টা-সাধনা করবে এবং প্রতি মুহূর্তে আত্মসমালোচনা করবে; সে তাকে ভালোকাজে পরিচালিত করবে এবং তাকে (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) আনুগত্য করতে বাধ্য করবে; ঠিক অনুরূপভাবে সে তাকে দূরে রাখবে যাতীয় খারাপ

ও মন্দ থেকে; আর তাকে সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য যা অইছু পদক্ষেপ নেয়ার জরুরত হবে শরীয়ত অনুযায়ী তা সে নিবে।

হিংসা

অহঙ্কারের পাশাপশি মানুষের অন্তরের সবচেয়ে নোংরা ও ক্ষতিকারক কাজ হলো হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, অমঙ্গল কামনা, পারস্পারিক শত্রুতা, ইত্যাদি। অন্তরে এগুলোর উপস্থিতি অন্তরকে কলুষিত করে, ভারাক্রান্ত করে, আল্লাহর যিকর থেকে বহু দূরে সরিয়ে দেয়। মোট কথা, অন্যান্য সকল নেক আমল নষ্ট করে দেয়।

প্রথমত, এ গুলোর কারণে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমা লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

تعرض أعمال الناس فى كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شخناء فيقال اتركوا أو اركعوا هذين حتي يفيئ

“প্রতি সপ্তাহে দুইবার - সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দাদের কর্ম (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তখন সকল মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তি বাদে যার ও তার অন্য ভাইয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে। এদের বিষয়ে বলা হয়, এদের বিষয় স্থগিত রাখ, যতক্ষণ না এরা ফিরে আসে।”[সহীহ মুসলিম ৪/১৯৮৮, নং ২৫৬৫]

অন্য এক হাদীসে মু’আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

يطلع الله إلي جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن (لأخيه)

“শা’বান মাসের মধ্যবর্তী রাত্রে (১৪ই শা’বানের দিবাগত রাত্রে) আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁর সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, শুধুমাত্র শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তির সাথে অন্য ভাইয়ের বিদ্বেষ রয়েছে তাদেরকে বাদে।” হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য। সার্বিকভাবে হাদীসটি সহীহ।[মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৬৫, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ ৩/১৩৫-১৩৯, নং ১১৪৪, সহীহুল জামিয়িস সাগীর ১/১৯৫, নং ৭৭১, ১/৩৮৫, নং ১৮৯৮, মাওয়ারিদুয যামআন ৬/২৭৮-২৮০।]

দ্বিতীয়ত, সকল নেক কর্ম ও ধর্ম ধ্বংস করে দেয়। যুবাইর ইবুনল আউআম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذى نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتي حتي تؤمنوا حتي تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم أفشوا السلام بينكم

"পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ব্যাধি তোমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে : হিংসা ও বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ মুন্ডন করে দেয়। আমি বলি না যে তা চুল মুন্ডন করে, বরং তা দ্বীন বা ধর্মকে মুন্ডন ও ধ্বংস করে দেয়। আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, বিশ্বাসী না হলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরে একে অপরকে ভালো না বাসলে তোমরা বিশ্বাসী বা মুমিন হতে পারবে না। এই ভালবাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, সর্বত্র ও সবর্দা পরস্পরে সালাম প্রদানের রেওয়াজ প্রচলিত রাখবে।" হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।[সুনানুত তিরমিযী ৪/৬৬৪, নং ২৫১০, মুসনাদ আহমাদ ১/১৬৪, মুসতাদরাক হাকিম ৪/১৮৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৩০, ইরওয়াউল গালীল ৩/২৩৭-২৪২, নং ৭৭৭।]

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে যয়ীফ সনদে বর্ণিত অন্য হাদীসে বলা হয়েছে:

إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب

"খবরদার! হিংসা থেকে আত্মরক্ষা করবে; কারণ হিংসা এমনভাবে নেককর্ম ধ্বংস করে ফেলে, যেমনভাবে আগুন খড়ি বা খড়কুটো পুড়িয়ে ফেলে।" হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে, তবে উপরের হাদীসের অর্থ তা সমর্থন করে।[সুনানু আবী দাউদ ৪/২৭৬, নং ৪৯০৩, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর, পৃ. ৩২৩, নং ২১৯৭।]

গর্ব,দাম্ভিকতা,অহংকার

গর্ব, দাম্ভিকতা, অহঙ্কার ও অহংবোধ মারাত্মক গুনাহ। যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খুবই অপছন্দনীয় এবং যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অসন্তুষ্টি ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণও হয়ে উঠে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

»إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْـمُسْتَكْبِرِيْنَ«

"নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) অহংকারীদেরকে ভালোবাসেন না"। (না'হল : ২৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَخْتَالُ فِيْ مِشْيَتِهِ وَيَتَعَاظَمُ فِيْ نَفْسِهِ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

"কোন ব্যক্তি গর্বভরে চলাফেরা করলে এবং যে সত্যিই আত্মম্ভরী সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তখন তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট থাকবেন"। (আহমাদ ৫৯৯৫ বুখারী/আল্-আদাবুল্ মুফ্রাদ্, হাদীস ৫৪৯; হা'কিম ১/৬০)

আবূ সা'ঈদ খুদ্রী ও আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِيْ عَذَّبْتُه.ُ

"ইয্যত তাঁর (আল্লাহ্ তা'আলার) নিম্ন বসন এবং গর্ব তাঁর চাদর। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমার সাথে দ্বন্দ্ব করবে তাকে আমি শাস্তি দেবো"। (মুসলিম ২৬২০)

মূসা (আঃ) সকল গর্বকারীদের থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় কামনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

»وَقَالَ مُوْسَى إِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ«

"মূসা (আঃ) বললো: যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাসী নয় সে সকল অহঙ্কারী ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর আশ্রয় কামনা করছি"। (গাফির/মু'মিন : ২৭)

সর্ব প্রথম গুনাহ্ যা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে করা হয়েছে তা হচ্ছে অহঙ্কার। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

»وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلاَّ إِبْلِيْسَ، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ«

"যখন আমি ফিরিশ্তাদেরকে বললাম: তোমরা আদমকে সিজদাহ্ করো। তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদাহ্ করলো। শুধুমাত্র সেই অহঙ্কার বশত সিজদাহ্ করতে অস্বীকার করলো। আর তখনই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো"। (বাক্বারাহ্ : ৩৪)

দলীল বিহীন যারা কুর'আন ও হাদীস নিয়ে অন্যের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তারা অবশ্যই অহঙ্কারী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

»إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، إِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ، مَا هُمْ بِبَالِغِيْهِ، فَاسْتَعِذْ بِاللهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ«

"যারা দলীল বিহীন আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ নিয়ে ঝগড়া করে তাদের অন্তরে রয়েছে শুধু অহঙ্কারই অহঙ্কার। তারা তাদের উদ্দেশ্যে কখনো সফলকাম হবে না। অতএব তুমি আল্লাহ্ তা'আলার শরণাপন্ন হও। তিনিই তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা"। (গাফির/মু'মিন : ৫৬)

'হা'রিসা বিন্ ওয়াহ্ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ قَالُوْا: بَلَى، قَالَ: كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.

"আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে সংবাদ দেবো না? সাহাবারা বললেন: অবশ্যই দিবেন। তখন তিনি বলেন: জাহান্নামী হচ্ছে প্রত্যেক কঠিন প্রকৃতির ধনী কৃপণ অহঙ্কারী"। (বুখারী ৪৯১৮, ৬০৭১, ৬৬৫৭; মুসলিম ২৮৫৩)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

تَحَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِيْ لَا يَدْخُلُنِيْ إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ.

“জাহান্নাম ও জান্নাত পরস্পর তর্ক করছিলো। জাহান্নাম বললো: আমাকে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী মানুষগুলো দেয়া হয়েছে যা তোমাকে দেয়া হয়নি। জান্নাত বললো: আমার কি দোষ যে, দুর্বল, অক্ষম ও গুরুত্বহীন মানুষগুলোই আমার ভেতর প্রবেশ করছে”। (মুসলিম ২৮৪৬)

‘আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌ঊদ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا يَدْخُلُ الْـجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْـجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

“যার অন্তরে অণু পরিমাণ গর্ব থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জনৈক সাহাবী বললো: মানুষ তো চায় যে, তার কাপড় সুন্দর হোক এবং তার জুতো সুন্দর হোক (তাও কি গর্ব বলে গণ্য হবে?) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা সুন্দর। অতএব তিনি সুন্দরকেই পছন্দ করেন। তবে গর্ব হচ্ছে সত্য প্রত্যাখ্যান এবং মানব অবমূল্যায়ন”। (মুসলিম ৯১)

‘আমর বিন্ শু‘আইব্ তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

يُحْشَرُ الْـمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِيْ صُوَرِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِيْ جَهَنَّمَ - يُسَمَّى بُوْلَسَ - تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ ؛ طِيْنَةِ الْـخَبَالِ.

“গর্বকারীদেরকে কিয়ামতের দিন মানুষের আকৃতিতেই ছোট পিপীলিকার ন্যায় উঠানো হবে। সর্ব দিক থেকে লাঞ্ছনা তাদেরকে ছেয়ে যাবে। “বূলাস” নামক জাহান্নামের একটি জেলখানার দিকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তাদের উপরে থাকবে শুধু আগুন আর আগুন এবং তাদেরকে জাহান্নামীদের পুঁজরক্ত পান করানো হবে”। (তিরমিযী ২৪৯২; আহমাদ ৬৬৭৭ দায়লামী, হাদীস ৮৮২১ বায্যার, হাদীস ৩৪২৯)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“একদা জনৈক ব্যক্তি এক জোড়া জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে (রাস্তা দিয়ে) চলছিলো। তাকে নিয়েই তার খুব গর্ববোধ হচ্ছিলো। তার জমকালো লম্বা চুলগুলো সে খুব যত্নসহকারে আঁচড়িয়ে রেখেছিলো। হঠাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেন এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই নিচের দিকে নামতে থাকবে”। (বুখারী ৫৭৮৯, ৫৭৯০; মুসলিম ২০৮৮)

সালামাহ্ বিন্ আকওয়া’ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِيْنِكَ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيْعُ، قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ.

"জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাম হাতে খাচ্ছিলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: ডান হাতে খাও। সে বললো: আমি ডান হাতে খেতে পারবো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ঠিক আছে; তুমি আর পারবেও না। দম্ভের কারণেই সে তা করতে রাজি হয়নি। অতএব সে আর কখনো ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি"।

(মুসলিম ২০২১ ইব্নু হিববান খন্ড ১৪ হাদীস ৬৫১২, ৬৫১৩ বাইহাক্বী, হাদীস ১৪৩৮৮ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ২৪৪৪৫; দা'রামী ২০৩২ আবূ 'আওয়ানাহ্, ৮২৪৯, ৮২৫১, ৮২৫২; আহমাদ ১৬৫৪০, ১৬৫৪৬, ১৬৫৭৮ ত্বাবারানী/কাবীর খন্ড ৭ হাদীস ৬২৩৫, ৬২৩৬; ইব্নু 'হুমাইদ্ ৩৮৮)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَـهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

"তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ্ থেকেও পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতেও তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক রাষ্ট্রপতি ও দাম্ভিক ফকির"। (মুসলিম ১০৭)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ.

"যে ব্যক্তি গর্ব করে নিজ নিম্ন বসন মাটিতে টেনে চলবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না"। (বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪; মুসলিম ২০৮৫)

নিফাক

মুখে ভালো প্রকাশ করা আর অন্তরে মন্দ গোপন রাখাকে নিফাক বলে। নিফাক দু'প্রকার। বড় নিফাক, আর তা হলো বিশ্বাসে নিফাক। যে ব্যক্তি অন্তরে নিফাকি ধারণ করে তাকে বলা

হয় মুনাফিক। মুনাফিকের স্থান চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। এ প্রকারের মুনাফিকের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ٨﴾ [البقرة: ٨]

"আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮]

এরা অন্তরে কুফুরী পোষণ করে আর মুখে ইসলাম প্রকাশ করে।

আর দ্বিতীয় প্রকার নিফাক হলো ছোট নিফাক, আর তা হলো মানুষের কাজে কর্মের নিফাক। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের সম্পর্কে বলেছেন,

«آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.»

"মুনাফিকের আলামত তিনটি: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।"[সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ১/৮৯, ৫/২৮৯, ৩৭৫, ১০/৫০৭, হাদীস নং ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৬০৯৫; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১/৭৮, হাদীস নং ৫৯। বুখারী ও মুসলিম উভয়েই হাদীসটি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।]

সুতরাং, বড় কুফুরী ও বড় নিফাকী ঈমান ও আমলের কোন উপকারে আসবে না। তবে ছোট কুফুরী ও ছোট নিফাকী ঈমানের সাথে মিশে যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে বান্দার মধ্যে ভালো-মন্দ দুটোই থাকবে এবং ভালো কাজের বিনিময়ে সাওয়াব পাবে আর মন্দ কাজের কারণে শাস্তি ভোগ করবে।আল্লহ তায়ালা আমাদেরকে নিফাকী থেকে হিফাজত করুন।

নবীজি (স.) দীনের ওপর অটল থাকতে এই দোয়া বেশি পাঠ করতেন- يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ 'ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুবি ছাব্বিত ক্বলবি আলা দীনিক।' অর্থ: হে মনের পরিবর্তনকারী, আমার মনকে দীনের ওপর স্থির রাখুন। (তিরমিজি: ৩৫২২)

দোয়া ছাড়াও মুনাফিকি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হাদিসে সুন্দর এক আমলের বর্ণনা পাওয়া যায়। ওই আমলে জাহান্নাম থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা দিয়েছেন নবীজি (স.)। সুন্দর আমলটি হলো- ৪০ দিন জামাতে নামাজ আদায় করা। তবে, হাদিস অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আমলটি করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন—'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে ৪০ দিন তাকবিরে উলার (ইমামের প্রথম তাকবির) সঙ্গে জামাতে নামাজ আদায় করবে, তাকে দুটি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হবে। ১. জাহান্নাম থেকে মুক্তি ২. মুনাফিকি থেকে মুক্তি।' (তিরমিজি: ২৪১)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহর মহব্বতে টানা ৪০ দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ইমামের প্রথম তাকবির বলার সঙ্গে আদায় করে, সে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্ত এবং মুনাফেকি থেকেও মুক্ত। (সুবহানাল্লাহ!) আমাদের পূর্বসূরিরা তাকবিরে উলাকে বেশ গুরুত্ব দিতেন।

তাবেয়ি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) একাধারে ৫০ বছর তাকবিরে উলার সঙ্গে নামাজ আদায় করেছেন। (হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৪/২১৫)

শাহওয়াত

ইবলিস আমাদের পর্যন্ত গুনাহগুলো পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে যে দ্বিতীয় রাস্তা ব্যবহার করে তার নাম হল, শাহওয়াত। শাহওয়াত মানে কামনা, বাসনা এবং যৌনতার প্রতি লালসা। ইবলিস আমাদের দেহের মাঝে এই কামনাগুলো তৈরি করে। আর শুবুহাত এর অর্থ হল, ওয়াসওয়াসা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে কুমন্ত্রণা দেওয়া সুতরাং ইবলিস শুবুহাত এবং শাহওয়াত এদু'টি রাস্তার মাধ্যমেই সকল গুনাহগুলো আমাদের মাঝে প্রবেশ করায় আর আমাদের নফস সেগুলো গ্রহণ করে।

অতিরিক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাকে বললেন, আমি তোমাকে দুনিয়া ও দুনিয়ায় অবস্থিত বস্তুসমূহ দেখাব। আমি আরয করলাম, খুব ভাল কথা। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে মদীনার একটি জঙ্গলে গেলেন। জঙ্গলের এক জায়গায় মৃত মানুষের মাথার খুলি, পায়খানা, হাড়গোড় ও ছিন্নবস্ত্র ছিল। তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা, এসব খুলি তেমনি আকাঙ্ক্ষা করত, যেমন তুমি কর এবং তেমনি আশা করত, যেমন তুমি কর; কিন্তু আজ এমন হয়ে গেছে যে, এগুলোর উপর চামড়া পর্যন্ত নেই। কিছুদিনের মধ্যেই এগুলো ভস্ম হয়ে যাবে। এই যে পায়খানা দেখছ, এগুলো তাদের খাদ্য ছিল। আল্লহ তায়ালা জানেন কোথা থেকে উপার্জন করে খেয়েছিল। আজ এমন হয়ে গেছে যে, তোমার ঘৃণা হয়। আর এই ছিন্নবস্ত্র ছিল তাদের পোশাক। বায়ু একে এদিক থেকে ওদিকে উড়িয়ে ফিরে। আর এই হাড়গুলো তাদের চতুষ্পদ জন্তুর, যেগুলোর পিঠে চড়ে তারা এক শহর থেকে অন্য শহরে যেত। ক্ষণভঙ্গুর দুনিয়ার যখন এই পরিণতি, তখন এটা শিক্ষা গ্রহণেরই স্থান।

দীর্ঘ আশা ও আকাঙ্খা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে, ঈমান ও আনুগত্য ত্যাগ করে, দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন হওয়া, তাওবাহ ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন পরিত্যাগ করা এবং মৃত্যু ও আখেরাত থেকে নিশ্চিন্ত দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া।

অর্থাৎ প্রয়োজন পুরা হওয়ার পরও তৃপ্তি না হওয়া। শুধু চাই আর চাই। একটি বাড়ির মালিক হওয়ার পরও, চলবে না, আরেকটি বাড়ির মালিক হতে হবে। একটি গাড়ির মালিক হওয়ার পরও, চলবে না, আরেকটি গাড়ির মালিক হতে হবে। এভাবে আশা আকাঙ্খাকে দীর্ঘ করা।

পবিত্র কুরআনে কারীমায় মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা (মরে) কবরে উপস্থিত হও। কখনও নয়, তোমরা

শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি, কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। সত্যিই, তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা জানতে (ঐ প্রতিযোগিতার পরিণাম)।' (সূরা তাকাসুর; ১-৫)

আত্মমর্যাদাহীনতা

মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্য বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ভালো গুণের চর্চা ও মন্দ স্বভাব পরিহারের মাধ্যমে আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠন ইসলামী শরিয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানে প্রেরিত হয়েছি।' (মুয়াত্তায়ে মালিক, হাদিস : ৮)

আত্মসম্মানহীন মানুষ মানবীয় অনেক গুণাবলি থেকে বঞ্চিত। ইসলাম মানুষকে আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন হতে বলে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মুমিন আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন আর আল্লাহ তাদের বেশি আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৭৬১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কেউ নেই। এ জন্য তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের অশ্লীলতা হারাম করেছেন। প্রশংসা আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দের।

তাই নিজের প্রশংসা নিজে করেছেন।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৫৮)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নবী (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার আত্মমর্যাদাবোধ আছে এবং আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ এই যে যেন কোনো মুমিন বান্দা হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে না পড়ে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২২৩)

আত্মমর্যাদা মানুষকে সৎ হতে এবং সৎপথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে—তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আত্মমর্যাদা ঈমানের অংশ আর আচরণে উগ্রতা কপটতার লক্ষণ।' (সুনানে বায়হাকি : ১০/২২)

মহানবী (সা.) আরো বলেন, 'এমন কিছু আত্মসম্মানবোধ আছে যা মহান মহিয়ান আল্লাহ পছন্দ করেন, আবার আত্মসম্মানবোধ এমনো আছে যা মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন।...আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ হলো সন্দেহ ও বদনামের ক্ষেত্রে যে আত্মসম্মানবোধ কাজ করে। আর আল্লাহর অপছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ হলো সন্দেহ ও বদনামের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র যে আত্মসম্মানবোধ কাজ করে। (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ২৫৫৮)

আল্লাহর সবচেয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। কোরআনে মুমিনকে আল্লাহর রং ধারণ করতে বলা হয়েছে। তাই ঈমানের দাবি হলো, মুমিন আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন হবে। ইরশাদ হয়েছে, 'আমরা আল্লাহর রং ধারণ করলাম। রঙে আল্লাহর চেয়ে কে বেশি সুন্দর? এবং আমরা তাঁরই ইবাদত করি।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৩৮)

ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা ও আত্মমর্যাদাবোধ লাভের পূর্বশর্ত আত্মা পরিশুদ্ধ করা। কেননা লোভ, লালসা, অহংকার, ঘৃণা, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি মানবীয় রিপু মানুষকে আত্মমর্যাদার পরিপন্থী ও পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'সফল ওই ব্যক্তি, যে আত্মা পরিশুদ্ধ করল এবং ক্ষতিগ্রস্ত ওই ব্যক্তি, যে তা কলুষিত করল।' (সুরা আশ-শামস, আয়াত : ৯-১০)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আত্মমর্যাদাহীন নির্লজ্জ মানুষের নিন্দা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে, তারা বলে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে এই কাজ করতে দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন। বলুন! নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না।’ (সুরা আরাফ, আয়াত : ২৮)

অন্য আয়াতে এসেছে, ‘তাদের পরে এলো অপদার্থ উত্তরসূরিরা, তারা নামাজ নষ্ট করল এবং লোভের বশবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি ভোগ করবে।’ (সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৯)

ইখলাসহীনতা

আবু ফেরাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আসলাম গোত্রের লোক। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ডাক দিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কি? তিনি বললেন, ”ইখলাস বা একনিষ্ঠতা।”[শু‘আবুল ঈমান লি আবি বাকর আল বাইহাক্বী হা/৬৪৪১]

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (একদা) বললেনঃ

”যা ইচ্ছা তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর।”

তখন জনৈক ব্যক্তি ডাক দিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কি?

তিনি বললেনঃ ”সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা।”

সে বলল, ঈমান কি?

তিনি বললেনঃ ”ইখলাস বা একনিষ্ঠতা।”

সে বলল, ইয়াক্বীন কি?

তিনি বললেনঃ ”(ইসলাম ধর্মের যাবতীয় বিষয়কে) সত্য প্রতিপন্ন করা।”[শু‘আবুল ঈমান লি আবি বাকর আল বাইহাক্বী হা/৬৪৪২]

(হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বায়হাক্বী)

মুসআব বিন সা’দ তার পিতা সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (সাদ) একবার মনে করলেন গণীমতের মালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর অন্যান্য সাহাবীর তুলনায়- তার বেশী অধিকার আছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

”আল্লাহ তো এই উম্মতের দূর্বল ব্যাক্তিদের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন- তাদের দু’আ, সালাত ও (কর্মে) ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার মাধ্যমে।”[সুনান আন-নাসাঈ হা/৩১৭৮, বাইহাক্বী হা/১২৯০৪, সহীহ বুখারি হা/২৮৯৬,]

(হাফেজ আবদুল আযীম আল মুনযেরী বলেনঃ হাদীছটি আরো বর্ণিত হয়েছে- ইবনে মাসউদ, মুআয বিন জাবাল, নূমান বিন বাশীর, জুবায়র বিন মুতঈম, আবু দারদা ও আবু কুরছাফা

জানদারা বিন খায়শানা ও আরো অনেক ছাহাবী (রাযিআল্লাহ আনহুম) থেকে এদের কিছু সনদ সহীহ্ভাবে বর্ণিত হয়েছে।)

আবু উমামাহ্ (রাঃ) বলেনঃ জনৈক ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট এসে বললঃ এমন লোক সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন, যে ছোয়াব ও প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে- সে কি প্রতিদান পাবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

''তার জন্য কোনই প্রতিদান নেই। লোকটি তিন বার কথাটি পূণরাবৃত্তি করলে প্রতিবারই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তার জন্য কিছুই নেই। তারপর তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা ইখলাছ ও তার সন্তোষটির উদ্দেশ্য ছাড়া কোন আমল কবূল করবেন না।''[সুনান নাসাঈ/৩১৪০]

(হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও নাসাঈ উত্তম সনদে। এ ধরণের হাদীছ জিহাদ অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ)

আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

''দুনিয়া অভিশপ্ত। উহার মধ্যস্তিত সকল বস্তুও অভিশপ্ত। তবে যে কাজের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তোষটি কামনা করা হয় তা অভিশপ্ত নয়।''[সুনান ইব্‌ন মাজাহ হা/৪১১২,সুনান আদ-দারেমী হা/৩২]

(হাদীছটি ত্বাবরানী বর্ণনা করেন।)

ঊমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একথা বলতে শুনেছিঃ

"যাবতীয় আমল (শুদ্ধ না অশুদ্ধ তা) নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যাক্তি যা নিয়ত করে তাই রয়েছে তার জন্য। সুতরাং যে ব্যাক্তি আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি বলেই গণ্য হবে। আর যে ব্যাক্তির হিজরত দুনিয়া অর্জন বা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্য হবে, তার হিজরত যে উদ্দেশ্য করেছে সে দিকেই গণ্য হবে।''[বুখারী হা/১, মুসলিম হা/১৯০৮, আবূ দাউদ হা/২২০১, তিরমিযী হা/১৬৪৭, নাসাঈ]

(হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

''একদল সৈনিক কাবা শরীফে যুদ্ধ করতে আসবে। তারা যখন "বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছবে কখন তাদের প্রথম ও শেষ ব্যাক্তিকে নিয়ে যমীন ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আমি (আয়েশা) বললামঃ কেমন করে তাদের প্রথম ও শেষ ব্যাক্তিকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, অথচ তাদের মধ্যে এমন লোকও তো রয়েছে যারা হাটে-বাজারে বেচা-কেনায় লিপ্ত থাকবে এবং এমনও লোক থাকবে যারা সে সৈনিক দলের অন্তর্ভুক্ত নয়? তিনি বললেনঃ তাদের প্রথম ও শেষ ব্যাক্তিকে

ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর নিয়ত অনুযায়ী তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।"[সহীহুল বুখারী হা/২০১২, সহীহ মুসলিম হা/২৮৮২, মুসনাদে আহমাদ হা/২৬৪৮৭]
(হাদীছটি ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেন।)
আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "মানুষকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী (কিয়ামতের দিন) উঠানো হবে।"
আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ
"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের দেহ এবং আকার-আকৃতি দেখেন না: বরং তিনি দেখে থাকেন তোমাদের অন্তর।" [একথা বলে তিনি আঙ্গুল দ্বারা নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।] এবং তিনি দেখে থাকেন তোমাদের আমল।"

দুনিয়াপ্রীতি

দুনিয়া এক রহস্য ঘেরা জায়গা। মানুষ এখানে আসে। শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের সিঁড়ি বেয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে। তারপর হঠাৎ একদিন চলে যায়। কোত্থেকে এলো, কেন এলো, কোথায় গেল- এসব প্রশ্ন প্রত্যেক মানুষের মনে বারবার উঁকি দেয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা দুনিয়ার মোহ ও সুখ-ভোগের নেশার নিচে চাপা পড়ে থাকে। দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কী? মানুষ এখানে কেন আসে, আবার কেনই বা এখান থেকে চলে যায়? এখানে তার করণীয় কী? দুনিয়ার কতটুকু অংশ গ্রহণীয়, আর কতটুকু বর্জনীয়? এসব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ মানুষের সূচনালগ্ন থেকেই নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। পক্ষান্তরে, কতিপয় দার্শনিকও নানাভাবে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে, দার্শনিকদের এসব জবাবের ভিত্তি হলো আন্দাজ-অনুমান। বিপরীত দিকে, নবী-রাসূলদের জবাবের ভিত্তি হলো ওহি; যা নির্ভুলতম জ্ঞান।
দুনিয়া সম্পর্কে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো এক অশ্বারোহীর ন্যায়, যে প্রচন্ড গরমে একদিন একটি গাছের ছায়ায় কিছু সময়ের জন্য নিদ্রা গেল, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।' (মুসনাদু আহমদ)

দুনিয়াপ্রীতি মানুষের বড় শত্রু। যারা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে, মহান আল্লাহ তাদের মন থেকে প্রশান্তি তুলে নেবেন। তাদের জীবন থেকে বরকত তুলে নেবেন। ফলে সে দুনিয়া ও আখিরাত দুটিই হারাবে।

আবান বিন উসমান থেকে বর্ণিত, জায়দ বিন সাবিত (রা.) দুপুরে মারওয়ানের কাছ থেকে বের হয়ে এলে আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার জন্য এ সময় তিনি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আমাদের শ্রুত কতক হাদিস শোনার জন্য মারওয়ান আমাদের ডেকেছেন। আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দারিদ্র্য তার নিত্যসঙ্গী হবে এবং পার্থিব স্বার্থ ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তকদিরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ তার সব কিছু সুষ্ঠু করে দেবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবেন এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাজির হবে।

(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪১০৫)

নবীজির এই হাদিসে উম্মতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে। কাজকর্মে অস্থিরতা, দারিদ্র্য মানুষের নিত্যসঙ্গী। মানসিক প্রশান্তির জন্য মানুষ কত কিছু করে, কিন্তু শান্তি কিছুতেই ধরা দেয় না। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় নবীজি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাতলে দিয়েছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۹﴾

‘হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-স¤পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স¥রণ থেকে উদাসীন করে না দেয়। যারা এরূপ করবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সূরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ০৯)

এ আয়াতে মুমিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন মুনাফিকদের মতো দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে না যায়। কেননা যেসব জিনিস দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহর যিকির বা স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয় তন্মধ্যে প্রধান দুটো জিনিস হলো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এ দুটো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপ কথা সূরা আলে-ইমরানের ১৪ নং আয়াতে মানুষের জন্য দুনিয়ার আকর্ষণীয় ছয়টি প্রিয় বস্তু উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

‘মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে আকর্ষণীয় বস্তুর আসক্তি- নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।’

অনুরূপভাবে সূরা আত-তাওবার ২৪তম আয়াতে মানুষের কাছে খুবই প্রিয় ও আকর্ষণীয় মোট ৮টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- বাপ-মা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, স্ত্রী-পরিজন, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বাসগৃহ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ দুনিয়াকে মানুষের পরীক্ষার জন্য অতি আকর্ষণীয় করে দিয়েছেন। কে এগুলোর আকর্ষণে মশগুল হয়ে পরকালকে ভুলে যায় এবং কে এসবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও পরকালীন কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে ব্যবহার করে। তাই সূরা আল-কাহাফের ৭ম আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

'আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যেন লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে।'

অনুরূপভাবে মুসআব ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও, তার রূপ হলো মনোহর সবুজ উদ্যানের ন্যায়। যা মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করে।' (কিতাবুয যুহদ, হা. ৬২, ১৮৩, ২৩৩)

গর্তে পড়ে থাকা একটি মৃত ভেড়া দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ফেলে দেওয়ার সময় মালিকের নিকট এ ভেড়াটি যতো তুচ্ছ মনে হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট দুনিয়া তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ।' (কিতাবুয যুহদ, হা. ১১৯)

সূরা আন-নিসার ৭৭তম আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'পার্থিব ভোগবিলাস সামান্য, আর মুত্তাকীদের জন্য আখিরাতই উত্তম।'

মহান আল্লাহ সূরা আত-তাগাবুনের ১৫শ আয়াতে আরও বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি তোমাদের জন্য ফেতনা, আর আল্লাহর নিকটে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।'

মানুষ দুনিয়ার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরকালকে ভুলে যায়। সূরা আত-তাওবার ৩৮তম আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।

সূরা তাকাছুরের প্রথমে মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে। এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও।' ধন-সম্পদের প্রতি লোভ বা মোহ মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَّلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ

'মানুষকে যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ দু'টি উপত্যকা দেওয়া হয়, তখন সে অপর একটির প্রত্যাশা করবে। মাটি ব্যতীত আর কোন দ্রব্যই মানব হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করতে পারে না।' (সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম)

দুনিয়ার প্রতি মহব্বত যাবতীয় অসৎ কর্মের মূল। আনাস (রা) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের মূল।'

শরীরের রোগ এবং আত্নার রোগের মধ্যে পার্থক্য

আত্মা নামে আমরা যাকে বুঝি তাকে আরবি ভাষায় কালব বলে। শরীর যেমন সুস্থ থাকে আবার অসুস্থও হয় তেমনি আত্মাও সুস্থ থাকে আবার অসুস্থও হয়। তাই শরীর অসুস্থ হলে যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন, তেমনি আত্মার অসুস্থতার জন্যও চিকিৎসার প্রয়োজন। বরং সেটি ফরজ।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ "

আবূ নু'আয়ম (রহঃ) ... নু'মান ইবনু বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, 'হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানেনা। যে ব্যাক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, উদহারন সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্‌র সংরক্ষিত চারণভুমির আশে পাশে চরায়, অচিরেই সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহ্‌রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি মাংসের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে মাংসের টুকরোটি হল কলব।

আত্নার রোগের সুচনালগ্ন/ নফসই সকল আত্নিক ব্যাধির মূল

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের রয়েছে নির্দিষ্ট করণীয় কাজ। কোন অঙ্গ বিকল বা অসুস্থ হয়ে গেলে সে অঙ্গের সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায় বা বাধাগ্রস্ত হয়। যেমন- চোখে অসুস্থতা দেখা দিলে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যায় বা লোপ পায়। কর্ণে অসুস্থতা দেখা দিলে শ্রবণশক্তি হ্রাস পায় বা হারিয়ে যায়। তেমনি আত্মা যখন রোগগ্রস্থ হয়, তখন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন যেমন- ঈমান, তাক্বওয়া, আল্লাহর ইবাদত, তাঁর ভালবাসা ইত্যাদি নেক আমল ও গুণাবলী হ্রাস পেতে থাকে বা হারিয়ে যায়। আত্মার এ

রোগসমূহের প্রতিকার করতে আত্মশুদ্ধি অর্জনই হচ্ছে ইসলাহে নফস। এটা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য্য বিষয়।

আত্মা বা অন্তরের রোগ সবচেয়ে কঠিন রোগ। কারণ অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিলে রোগী নিজেও বুঝতে পারে, তার অসুস্থতা দেখা দিয়েছে- চিকিৎসা দরকার। আর চিকিৎসকও বিভিন্ন উপসর্গ দেখে রোগ নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিতে সক্ষম হন। কিন্তু আত্মার রোগ এমন জটিল যে, এর রোগী নিজেও বুঝতে পারে না যে, তিনি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আর বুঝতে পারলেও তার চিকিৎসা এত কষ্টসাধ্য যে, রিয়াজত-মুজাহাদা করে সেই রোগ দূর করার জন্য মানুষ তৎপর হতে চায় না। কারণ এ রোগের প্রধান চিকিৎসা হলো- মনের বিরুদ্ধে চলা। অথচ মানুষ মনের চাহিদানুযায়ী চলতে আগ্রহী থাকে বেশী। আর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পরীক্ষা বটে। তাই এ অন্তরের রোগ উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে দূর করে আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অন্তর শরীরের আর দশখানা অঙ্গের মত নিছক একটি অঙ্গই নয়, এটি হচ্ছে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা এবং তাদের সকল কল্যাণ ও অকল্যাণের মূল উৎস। এ সম্পর্কে রাসূলে কারীম (সা:) ইরশাদ করেছেন, “জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে এমন এক টুকরা গোশতপিন্ড রয়েছে যে, সেটা যদি ঠিক থাকে, তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে। আর যদি সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রেখো, সেটা হচ্ছে ক্বালব বা অন্তর।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) তাই অন্তরের রোগসমূহের উপযুক্ত চিকিৎসা করে তার পরিশুদ্ধি অর্জন করা খুবই জরুরী বিষয়। তা-ই পরকালীন নাজাতের পথ। আল্লাত তা’আলা ইরশাদ করেন-“সেদিন (হাশরের দিন) অর্থ ও সন্তান-সন্ততি) কোন কাজে আসবেনা, শুধু পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে যে আসবে আল্লাহর কাছে (তার জন্যই রয়েছে নাজাত)।” (সূরাহ শু’আরা, আয়াত নং-৮৯)

১। সুস্থ অন্তর (নফসে মুতমাইন্না) এমন অন্তর যা যাবতীয় কলুষতা থেকে মুক্ত। আল্লাহর মহব্বত ও ভালবাসায় সমৃদ্ধ হয়ে নেক কাজে সতর্ক ও হুঁশিয়ার।

২। মৃত অন্তর (নফসে আম্মারা) হচ্ছে যে অন্তর যাবতীয় কলুষতায় ভরপুর। তা পাপ কাজে এমনভাবে লিপ্ত যে, পাপ কাজের প্রতি ঘৃণাও উঠে গেছে। আল্লাহকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়ার কারণে যাবতীয় কল্যাণ থেকে তা বঞ্চিত। আর নফল ও শয়তানের একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হয়।

আত্নার ব্যাধিসমূহের প্রতিকার/প্রতিষেধক:

দুশ্চিন্তা ও হতাশার কারণে মানুষের মাঝে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসমালোচনা না করার কারণে এবং দীর্ঘ আশার ধোঁকায় পড়ে কলব নষ্ট বা রুগ্ন হয়। মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি, পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ নেই, যার কোনো চিকিৎসা আল্লাহ তায়ালা দেননি। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে। সুতরাং রোগে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগ করা হলে মহান ও মহীয়ান আল্লাহর হুকুমে রোগ নিরাময় হয়' (মুসলিম : হাদিস : ৫৫৫৩)। মানসিক চাপসহ নানাবিধ রোগবালাই থেকে উত্তরণে দ্বীন ইসলামের শিক্ষাগুলো অত্যন্ত কার্যকর।

তাওবা ও ইস্তেগফার

তাওবা ও ইস্তিগফার একজন মুমিন ও মুত্তাকী বান্দার এক বিশেষ গুণ। মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছামতন মোতাবেক চলার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে, তাই আল্লাহ তাআলা তার সে ভুল বা গুনাহ থেকে মুক্তিদানের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফারের সুবিশাল নিয়ামত রেখেছেন। এই তাওবা ও ইস্তিগফার একজন মুমিনকে দান করে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ জীবন। মুমিনকে সর্বদা গুনাহমুক্ত জীবনের প্রতি করে অনুপ্রাণিত। মুমিনকে নিয়ে যায় ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে উন্নতি ও মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে।

তাই তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনের জীবনের এক অপরিহার্য বিষয়। তাকওয়াপূর্ণ ও গুনাহমুক্ত জীবন লাভ করতে যা একান্ত জরুরি। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে মুত্তাকীদের গুণাবলির বর্ণনা দিয়ে বলেন—

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللهُ
وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ.

এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনোভাবে) নিজেদের প্রতি যুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে— আর আল্লাহ ছাড়া কেইবা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে। আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না। —সূরা আলে ইমরান (০৩) : ১৩৫

নবী-রাসূলগণ নিজেরা যেমন আপন প্রতিপালকের কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করেছেন,তেমনি উম্মতকেও তাওবা ও ইস্তিগফার করতে আদেশ করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন। যদিও নবী-রাসূলগণের তাওবা-ইস্তিগফার ও উম্মতের তাওবা ইস্তিগফারের মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য

রয়েছে। কারণ অবশ্যই নবী-রাসূলগণ মা'সূম ও নিষ্পাপ। তাঁদেরকে আল্লাহ গুনাহ থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁদের উম্মত তো মা'সূম ও নিষ্পাপ নয়। তাই নবীগণের তাওবা ও ইস্তিগফার হয়ে থাকে কেবলমাত্র নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। আর উম্মতের তাওবা ও ইস্তিগফার তো কখনো নিজেদের গুনাহের ক্ষমার জন্য, আবার কখনো বা নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে।

رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। সূরা আ'রাফ (০৭) : ২১

رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِیْنَ اِلَّا تَبَارًا.

হে আমার রব! আপনি আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং আমার ঘরে যারা ঈমানের সঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং মুমিন নর-নারীদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি যালেমদেরকে ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। —সূরা নূহ (৭১) : ২২

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَغَفَرَ لَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতি যুলুম করেছি। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তাই তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। —সূরা কাসাস (২৮) : ২৪

عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

হযরত আগার ইবনে ইয়াসার আলমুযানী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। কেননা আমি দিনে একশত বার তাওবা করি। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭০২

এখানে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত বান্দা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের গোটা জীবন আল্লাহ তাআলার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তাই তারা যাবতীয় গুনাহ থেকে দূরে থেকে জীবন যাপন করেন। এজন্যই আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্ববাদী আকীদা হল, নবী ও রাসূলগণ মা'সূম ও নিষ্পাপ। তাই আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের মুখে তাওবা ও ইস্তিগফার উচ্চারিত হওয়ার অর্থ কখনোই এ নয় যে, তারা তাদের গুনাহের জন্য বা নবুওতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তারা তাওবা ও ইস্তিগফার করে থাকেন; বরং তারা তো তাওবা ও ইস্তিগফার করেন আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বা তাঁদের থেকে অধিক উত্তম কাজের তুলনায় কম উত্তম

কাজ সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং সঙ্গে সঙ্গে উম্মতকে তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِیْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَیْهِ ؕ اِنَّ رَبِّیْ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ۝

আমি ছামুদ জাতির কাছে সালেহকে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তোমাদেরকে তাতে বসবাস করিয়েছেন। তাই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয়ই আমার রব অতি নিকটে এবং দুআ কবুলকারী। —সূরা হুদ (১১) : ৬১

এভাবেই সকল নবীগত উম্মতকে আল্লাহর দরবারে নিজেদের ভুলত্রুটি ও গুনাহের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করার আদেশ করেছেন এবং নিজেদের জীবনকে শিরকের গুনাহ থেকে শুরু করে সকল গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষা দিয়েছেন। তাই দ্বীন ও শরীয়তে তাওবা ও ইস্তিগফারের গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۝

আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। —সূরা বাকারা (০২) : ১৯৯

তিনি আরও বলেন—

وَ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَیْهِ ؕ اِنَّ رَبِّیْ رَحِیْمٌ وَّدُوْدٌ۝

তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর কাছে ফিরে আস। নিশ্চয়ই আমার রব অতি দয়ালু ও অধিক মমতাময়।—সূরা হুদ (১১) : ৯০

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِیْهِمْ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ۝

আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় কিছুতেই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায়ও তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। —সূরা আনফাল (০৮) : ৩৩

এমনকি তাওবা-ইস্তিগফারের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো জাতির উপর শাস্তি আসার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও সে শাস্তিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে হযরত ইউনুস আ.-এর কওমের ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْیَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ اِیْمَانُهَاۤ اِلَّا قَوْمَ یُوْنُسَ ؕ لَمَّاۤ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰی حِیْنٍ۝

কেন কোনো জনপদ(বাসীরা) ঈমান আনয়নকারী হল না? তাহলে তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত। তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতিক্রম। তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি

পার্থিব জীবনে তাদের উপড় থেকে লাঞ্ছনার আযাব তুলে নিলাম এবং তাদেরকে একটা সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম। —সূরা ইউনুস (১০) : ৯৮

হযরত ইউনুস আ. তাঁর কওমকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে বহুভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন; কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিল না। বরং তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনে ডুবে থাকল। তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আসার প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে দিলেন। হযরত ইউনুস আ. যেহেতু বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের উপর তো এখন শাস্তি আসা অবধারিত, তাই তিনি নিজ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। তারা হযরত ইউনুস আ.কে যখন খুঁজে পেল না তখন তারা বুঝতে পারল যে, এখন তো আমাদের উপর শাস্তি এসেই যাবে। তাই তারা তাওবা-ইস্তিগফার করতে লাগল। তাদের এ অবস্থা দেখে আল্লাহ তাআলা আর শাস্তি প্রেরণ করলেন না। এভাবে তারা তাওবা ও ইস্তিগফারের ফলে আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে গেল। সুবহানাল্লাহ!

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনের পার্থিব নিআমত, শক্তি সামর্থ্য ও যাবতীয় সমৃদ্ধি লাভে সাহায্য করে।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا، يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا، وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُم اَنْهٰرًا.

আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দেবেন। তিনি তোমাদের জন্য বিভিন্ন উদ্যান ও নদ-নদী সৃষ্টি করে দেবেন। —সূরা নূহ (৭১) : ১০-১২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَ يٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَ لَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْن.َ

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর কাছে তাওবা কর। তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। তোমাদের শক্তিকে আরও বাড়িয়ে দেবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না। —সূরা হুদ (১১) : ৫২

এভাবে কুরআন মাজীদ তাওবা ও ইস্তিগফারের অনেক ফায়দা ও উপকারের কথা তুলে ধরেছে। তাই আল্লাহ তাআলার ক্ষমা, দয়া এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সব দিক থেকে তাঁর সাহায্য লাভ করার জন্য তাওবা ও ইস্তিগফারের বিকল্প নেই।

তাওবা ও ইস্তিগফারের উপকারিতায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: مَنْ لَزِمَ الاستغفارَ جَعَلَ الله له من كل ضيق مَخرَجاً، ومن كل هم فرَجاً، ورزقَه من حيث لا يحتسب.

যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে আল্লাহ তাআলা তার সকল সংকট থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করে দেন, তার সকল পেরেশানী দূর করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৮

মোটকথা, তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে একজন মুমিনের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সফল হয়। এর মাধ্যমে একজন মুমিন লাভ করে উভয় জাহানের সমৃদ্ধি। সর্বোপরি তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহ তাআলার নিকটতম বান্দায় পরিণত হয়।

সবর ও শুকর

দ্বীন ও দুনিয়ার সর্বাঙ্গীন সাফল্যে, মুমিনের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের সার্বিক কল্যাণে সবর ও শোকর পালন করে এক অনবদ্য ভূমিকা। সবর ও শোকর মূলত ইমানেরই দুটি অংশ। ইসলামি শরিয়ার প্রতিটি আহকামের সঙ্গে রয়েছে এই দুটির নিবিড় সম্পর্ক।

খুবই কুৎসিত এবং ছোট আকৃতির লোক ছিলেন তাবেঈ ইমরান বিন হাত্বান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিল খুবই সুন্দরী। একদিন ইমরান বিন হাত্বান বাড়ি এসে দেখলেন তাঁর স্ত্রী নতুন পোশাকে অপরূপা হয়ে আছে। দেখতেও চমৎকার সুন্দর লাগছিল তাকে। স্ত্রীর দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাতেই তার স্ত্রী বলে উঠলো- 'ইন শা আল্লাহ; আমরা উভয়ে জান্নাতি হবো'; কিন্তু কেন? এমন কি ঘটলো যে তিনি এমনটি বললেন?

সঙ্গে সঙ্গেই ইমরান স্ত্রীর কথা শুনে বললেন, 'তা কি করে?

এবার স্ত্রী বললো- একজন সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে তুমি অত্যন্ত শোকর-গুজার আছ। আর আমি তোমার মতো কুৎসিত স্বামীকে নিয়ে ধৈর্য ধরেছি। আর আল্লাহ তাআলা তো শোকর-গুজার ও সবরকারীদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

হ্যাঁ, তাইতো; তাবেঈ ইমরান বিন হাত্বান-এর স্ত্রী দুইটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের বিনিময়ের কথাই বলেছেন। যে আমল দুইটির বিনিময় শুধুই জান্নাত। হাদিসে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ঘোষণা করেছেন।

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, 'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে বনি আদম! যদি তুমি ধৈর্যধারণ কোরো ও প্রথম দুঃখের সময় অধৈর্য না হয়ে তাতে সাওয়াবের আশা করো; তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ছাড়া কোনো প্রতিদানে সন্তুষ্ট হবো না।' (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে শোকর-গুজার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। শোকর-গুজার করলে পুরস্কার বাড়িয়ে দেওয়ার কথাও বলেছেন। আবার অকৃতজ্ঞ হতে নিষেধ করেছেন। যারা অকৃতজ্ঞ হবে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

'যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর, তবে তোমাদেরকে আরও (পুরস্কার) বাড়িয়ে দেব আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।' (সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৭)

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, তাবেঈ হজরত ইমরান বিন হাত্বান-এর স্ত্রীর মতো শোকর-গুজার ও সবরকারী হওয়া। তিনি তো কোরআন-সুন্নাহর ঘোষণায় পেয়েছেন জান্নাতের অঙ্গীকার। তাই শুকরিয়া জ্ঞাপনে হজরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের মতো এভাবে দোয়া করা-

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

(সুরা নামল : আয়াত ১৯)

অর্থ : হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে তোমার দেওয়া সেসব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সামর্থ দাও। যেসব নেয়ামত তুমি আমাকে ও আমার বাবা-মাকে দান করেছ। আর আমি যাতে তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।'

দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যত কঠিনই হোক না কেন, তাতে ধৈর্যধারণ করা যেমন জরুরি। আবার প্রতিটি বিষয়ে শোকর-গুজার করা আরও বেশি জরুরি। কেননা কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা আরও ঘোষণা করেন-

'কসম যুগের (সময়ের); নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।' (সুরা আসর : আয়াত ১-৩)

মহান আল্লাহ যখন আপনার কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেন, তখন যদি আপনি শুধুমাত্র ধৈর্য ধারণ করেন এবং তার কাছ থেকে আপনার পুরস্কার প্রার্থনা করেন, তবে তিনি আপনাকে তার চেয়েও ভালো কোন কিছু দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে অথচ সে ধৈর্য ধরে, তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত (বেহেশত) দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।"

অন্য হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যদি কেহ এ জগত থেকে তার প্রিয় কাউকে হারিয়ে তার প্রভুর নিকট এর প্রতিদান প্রার্থনা (কামনা) করে তবে তাকে জান্নাত দিয়ে এর খেসারত দেয়া হবে।"

অতএব, কোন দুভাগ্যজনক ঘটনার জন্য অত্যন্ত দুঃখবোধ করবেন না। কারণ, যে মহান সত্তা এর হুকুম (আদেশ) দিয়েছেন তার নিকট এর ক্ষতিপূরণ ও এক মহাপুরস্কার জান্নাত রয়েছে। যারা এ পৃথিবীতে দুর্দশা কবলিত ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত তারা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে প্রশংসিত হবে।

"তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক; কেননা, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে; চূড়ান্ত গৃহ কতই না চমৎকার।" (১৩-সূরা রাআদ: আয়াত-২৪)
কষ্ট সহিষ্ণুতার কারণে কেউ যে পুরস্কার পায় আমাদেরকে অবশ্যই তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।
"তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের ওপরেই কল্যাণ (অর্থাৎ তারাই ধন্য এবং তাদেরকে ক্ষমা করা হবে) ও তারাই তার অনুগ্রহ লাভ করে এবং তারাই সঠিকপথ প্রাপ্ত।" (২-সূরা বাকারা: আয়াত-১৫৭)
বাস্তবিক এ পার্থিব জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত ও এর ধন ভাণ্ডার খুবই নগণ্য। পরকাল উত্তম ও চিরস্থায়ী এবং এ জগতে যে সমস্যা জর্জরিত পরজগতে সে তার পুরস্কার পাবে। এখানে (দুনিয়াতে) যে-ই কঠোর পরিশ্রম করবে সেখানে (আখিরাতে) সে-ই শান্তি পাবে। যারা এ জগতের প্রতি আসক্ত, যারা এর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে, যারা এর প্রেমে পড়েছে, তাদেরকে যে সর্বাপেক্ষা কঠিন ভোগান্তি পোহাতে হবে তা হলো- তারা এ পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধ (শান্তি ও সম্পদ) হারাবে। তারা শুধুমাত্র ইহজীবনকেই উপভোগ করতে চায়। তাদের এ কামনার কারণেই তারা এ জগতের মুসিবতকে কঠিন ভাবে। তারা তাদের চারপাশে ইহজীবন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তারা দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও নগণ্যতা (তুচ্ছতা) দেখতে পায় না। হে দুর্দশা কবলিতরা! যদি আমরা ধৈর্য ধারণ করি তবে আমরা কোন কিছু হারাবো না ইন শা আল্লহ। দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির উচিত পরকালের ফলাফলকে ভেবে দেখা- যে ফলাফল ধৈর্যশীলদের জন্য নির্ধারিত।
মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না।" (সূরা বাকারা ১৫২ আয়াত)
তিনি অন্যত্র বলেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" (সূরা ইব্রাহীম ৭ আয়াত)
তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

"বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।" (সূরা ইসরা ১১১ আয়াত)
তিনি আরও বলেছেন,

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"তাদের শেষ বাক্য হবে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)।" (সূরা ইউনুস ১০ আয়াত)

আমরা পাঁচভাবে শোকর আদায় করতে পারি :
১. যবানের মাধ্যমে শোকর।
২. দিলের মাধ্যমে শোকর।
৩. আমলের মাধ্যমে শোকর।
৪. নিআমতের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শোকর।
৫. নিআমতের অন্যায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে শোকর।

হাসি-কান্না, ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন নিয়েই আমাদের জীবন। জীবনে কখনো ফাগুনের ধারা বয়, কখনো-বা কালো মেঘে ছেয়ে যায় চলার পথ। যখন ফাগুনধারা বইবে আপনার জীবনে তখন শোকর আদায় করবেন। কারণ, এই ধারা আপনার প্রচেষ্টায় বয়নি। স্রষ্টার হুকুমেই বয়েছে। আর যখন কালো মেঘে ছেয়ে যাবে আপনার আকাশ, তখন সবর করবেন। কারণ, আপনার স্রষ্টা আপনাকে পরীক্ষা করছেন। সত্যি বলতে কী, জীবনটা ভয়ানক খাদের মতো। এই খাদ পেরিয়ে মঞ্জিলে পৌঁছুতে হলে আপনাকে অবশ্যই শোকরের পাটাতনে পা রেখে মজবুত করে সবরের রশি আঁকড়ে ধরতে হবে। নয়তো নিজের অজান্তেই খাদে পড়ে যাবেন। (সবর ও শোকর: আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযী)

তাওয়াক্কুল

তাওয়াক্কুল' শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো নির্ভর করা, ভরসা করা, আস্থা রাখা। 'তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ' অর্থ আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ইসলামের পরিভাষায় যেকোনো প্রয়োজন কিংবা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করাকে তাওয়াক্কুল বলে।
আল্লাহর উপর ভরসা ফরজ।আল্লাহর উপর ভরসা করা ঈমানের শর্ত।
আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (المائدة: ২৩)

"তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করো।" (মায়েদা : ২৩)
আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. (الانفال: ২)

"একমাত্র তারাই মোমিন যাদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়।" (আনফাল . ২)
যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. (الطلاق: ৩)

“ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।” (সূরা তালাক . ৩)

ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

حسبنا الله ونعم الوكيل এ কথা ইবরাহীম (আঃ) তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। আর মুহাম্মদ (স:) একথা বলেছিলেন তখন, যখন তাঁকে বলা হলো,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا.

“লোকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বাহিনী জড়ো করেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করুন। তখন তাঁদের ঈমান আরো বৃদ্ধি গেলো”। (আল-ইমরান: ১৭৩)।

আল্লাহর ওপর ভরসা করার নানা পর্যায় রয়েছে। কেউ মুখে মুখে ভরসার কথা বলে, কেউ সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের ভরসা করে, কেউ বা সর্বদাই সব কাজে আল্লাহর ওপর ভরসা করে। এটি তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ পর্যায়। আল্লাহর ওপর যার আস্থা যত বেশি, তার সফলতা ও পরিপূর্ণতা তত বেশি। কারণ সফলতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে।

তাওয়াক্কুল একটি গুণ, একটি ইবাদত।এটি অর্জন ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ থাকে। অন্য আয়াতে এসেছে : ‘তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর ভরসা করো।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯)

আমরা যদি আল্লাহর ওপর শতভাগ তাওয়াক্কুল করতে পারি তবে দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই আমাদের হাতে ধরা দিবে ইন শা আল্লহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভরশীল হতে তাহলে পাখিদের যেভাবে রিজিক দেওয়া হয় সেভাবে তোমাদেরও রিজিক দেওয়া হতো। এরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৪৪)

শুধু দুনিয়াই নয়, আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের পুরস্কার আখিরাতেও পাওয়া যায়। বুখারি শরিফে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, তাওয়াক্কুলের পুরস্কার বিনা হিসাবে জান্নাত। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নেয় না, শুভ-অশুভ মানে না এবং তাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা রাখে। (বুখারি, হাদিস : ৬৪৭২)

আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করার মানে এই নয় যে আসবাব ও উপকরণ গ্রহণ করা বৈধ। কেননা আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে দারুল আসবাব তথা উপকরণের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন। তাই আসবাব বা উপকরণ গ্রহণ করতে হবে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন হজ করত কিন্তু সঙ্গে পাথেয় নিয়ে আসত না। আবু মাসউদ বলেন, ইয়েমেনের কতিপয় লোক হজে যেত; কিন্তু সঙ্গে পাথেয় আনত না এবং তারা বলত যে আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছি। অথচ মক্কায় পৌঁছার পর তারা ভিক্ষা করত। ফলে মহান আল্লাহ

অবতীর্ণ করলেন, 'তোমরা হজের সফরে সঙ্গে পাথেয় নিয়ে যাবে, আর জেনে রেখো, তাকওয়াই হলো উত্তম পাথেয়। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৭৩০)

হাসান বসরি (রহ.) বলেন, 'রিজিক অন্বেষণের ক্ষেত্রে কোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। যেমন—কোনো যানবাহনে আরোহণ করেই গন্তব্যস্থলে কেউ নিরাপদে পৌঁছে যাবে তার নিশ্চয়তা নেই; বরং নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে।' ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, 'তাওয়াক্কুল হলো ইমানের অর্ধেক। আর দ্বিতীয় অর্ধেক হলো, আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা। কোনো কিছু পাওয়ার জন্য শরিয়ত সমর্থিত বৈধ উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়।'

ইখলাস

একজন মুমিন ব্যক্তির যাবতীয় কাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আমল ও ইবাদতের সওয়াব এর ওপর নির্ভরশীল। অন্য অর্থে এটাকে বলা হয় ইখলাস। খালেস দিলে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইবাদত ও যাবতীয় আমল করার নামই হলো ইখলাস।

কে আমাকে দেখছে আর কে দেখছে না, সেটা না ভেবে 'আল্লাহ সর্বক্ষণ আমাকে দেখছেন'—এই ভয় ও ভাবনা মাথায় রেখে ইবাদত করার নাম ইখলাস। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী। তারা আল্লাহকে ভালোবেসে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিদের আহার দেয়। (তারা বলে) শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদের আহার দান করি।তোমাদের কাছে আমরা কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।' (সুরা দাহর, আয়াত : ৭-৯)

মুমিনদেরকে সকল আমল-ইবাদাত পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের এ ছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।' (সুরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত : ৫)

ইখলাস হচ্ছে আমল ও ইবাদতের প্রাণ। এর অনুপস্থিতে আমল ইবাদত রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে।শিরক হয়ে যেতে পারে।

ইখলাসের সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে,দিলের সঙ্গে,ক্বলবের সঙ্গে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহপাক তোমাদের শরীর ও অবয়বের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে লক্ষ করেন।' (মুসলিম, হাদিস : ২৫৬৪)

ইখলাসের সঙ্গে অল্প আমল অধিক পরিমাণ সওয়াবের কারণ। হাদিসে এসেছে, ‘তোমার ঈমান খাঁটি করো, অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট।’ (বাইহাকি, শুআবুল ইমান, হা. ৬৪৪৩)

যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যের নৈকট্য লাভের নিয়ত করে এবং ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়ত করা হয়, তাহলে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে। এটা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ বলেন,

«أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»

“আমি সমস্ত শরীকদের চেয়ে শির্ক থেকে অধিক মুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যাতে সে আমার সাথে অন্য কোনো কাউকে শরীক করল, আমি তাকে এবং সে যা শরীক করল, তাকে প্রত্যাখ্যান করব।”[সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুয জুহদ ওয়ার রাকায়েক।]

যদি আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত দুনিয়ার কোনো স্বার্থ হাসিলের নিয়ত করা হয় যেমন, নেতৃত্ব লাভ, সম্মান লাভ ইত্যাদি তাহলে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে। এ ধরণের আমল তাকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٦﴾ [هود: ١٥، ١٦]

“যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, হয় আমরা তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হলো সেসব লোক যাদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল, সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট।” [সূরা হূদ, আয়াত: ১৫-১৬]

প্রথম প্রকার শির্ক এবং এ প্রকার শির্কের মাঝে পার্থক্য এ যে, প্রথমটি আল্লাহর ইবাদাতকারী হিসেবে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়তের অন্তর্ভুক্ত আর দ্বিতীয়টিতে আল্লাহর ইবাদাতকারী হিসেবে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়ত করা হয় নি। এতে মানুষের প্রশংসার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপও নেই।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ ٥٨﴾ [التوبة: ٥٨]

“তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা সাদকা বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। সদকা থেকে কিছু পেলে তারা সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৮]

আবু দাউদ শরীফে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে, একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো লোক যদি দুনিয়ার কোনো সম্পদ লাভের আশায় জিহাদে যায় তবে তার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য

কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে। লোকটি কয়েকবার প্রশ্ন করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারই বললেন, সে ব্যক্তি ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ«

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরত করবে অথবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত তার নিয়ত অনুযায়ীই হবে।"[সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবু বাদউল অহী; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ইমারাত।]

জিকির

পাপে হৃদয় কলুষিত হয়, ক্বলবে ধরে জং, নষ্ট করে মানসিক প্রশান্তি, বাড়ায় হতাশা, বিষণ্নতা ও হাজারও দুর্ভাবনা।

জিকির অর্থ স্মরণ করা। আল্লাহর সকল প্রকার স্মরণই আল্লাহর যিকর ও আল্লাহর নামের যিকর। এ কারণেই সকল ইবাদতকেই কুরআন ও সুন্নাহে আল্লাহর যিকর হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তবে সকল ইবাদত যিকর হলেও এ সকল ইবাদতের পৃথক পৃথক নাম আছে। এছাড়া আল্লাহর নামের গুণগান বারংবার উচ্চারণ বা 'জপ' করাকে বিশেষভাবে কুরআন ও সুন্নাহে "আল্লাহর যিকর" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআন, হাদীস, উসূলুল ফিকহ, ফিকহ, তাসাউফ সকল ক্ষেত্রে বা এককথায় ইসলামী পরিভাষায় সাধারণভাবে 'যিকর', 'আল্লাহর যিকর', 'আল্লাহর নামের যিকর' ইত্যাদি বলতে এই প্রকারের যিকর বুঝানো হয়।

কুরআন কারীমের অন্যতম নাম 'যিকর' ও 'আল্লাহর যিকর'। কুরআনই যিকর, কুরআনই ওয়ায, কুরআনই উপদেশ। ইরশাদ করা হয়েছেঃ

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ

"ইহা প্রজ্ঞাময় কুরআন ও যিকর যা আমি আপনার উপর তিলাওয়াত করি।"[1]

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিশ্চয় আমি যিকর নাযিল করেছি এবং আমিই তাকে রক্ষা করব।[সুরা হিজরঃ ৯।]

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"এবং আমি আপনার প্রতি যিকর নাযিল করেছি যেন আপনি মানবজাতিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন তাদের উপর যা নাযিল হয়েছে।"[সূরা নাহলঃ ৪৪।]

وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ

"এবং ইহা একটি বরকতময় যিকর যা আমি নাযিল করেছি।"[সূরা আম্বিয়াঃ ৫০।]

এভাবে আরো অনেক স্থানে কুরআন কারীমকে যিকর ও আল্লাহর যিকর বা উপদেশ ও ওয়ায হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছেঃ

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ

“ধ্বংস ও ক্ষতি তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর যিকর থেকে শক্ত হয়ে গিয়েছে।”[সূরা যুমারঃ ২২।]

এখানেও যিকর বলতে কুরআন বুঝানো হয়েছে। ইমাম তাবারী বলেনঃ আল্লাহর যিকর অর্থ কুরআন, যা আল্লাহ তা’আলা নাযিল করেছেন এবং তার দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়েছেন ও উপদেশ প্রদান করেছেন।’[তাবারী, তাফসীর ২৩/২০৯।]

কুরআন কারীমের একাধিক স্থানে মসজিদগুলিকে ‘আল্লাহর নামের যিকরের স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ইরশাদ করা হয়েছেঃ

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

“সেই গৃহসমূহে (মসজিদসমূহে) যেগুলিকে উচ্চ করার ও যেগুলির মধ্যে আল্লাহর নামের যিকর করার অনুমতি (নির্দেশ) আল্লাহ প্রদান করেছেন...।”[সূরা নূরঃ ৩৬। দেখুন সূরা বাকারাঃ ১১৪, সূরা হাজ্জঃ ৪০।]

এর তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহর নামের যিকর করা হয় অর্থ আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা হয়।”[তাফসীরু ইবনি কাসীর ৩/২৯৫।]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,বান্দা যখন পাপ করে তখন তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে আরো দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এভাবে তার পুরো অন্তর কালো দাগে ঢেকে যায়। (তিরমিজি: ৩৩৩৪)

ক্বলব থেকে পাপের কালিমা দূর করার অন্যতম মাধ্যম হলো জিকির। জিকির মানুষের কলবকে করে পরিষ্কার এবং তাজা। দূর করে মানসিক বিষন্নতা ও পেরেশানি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, জেনে রাখ, জিকিরের মাধ্যমে মন শীতল এবং প্রশান্ত হয়। (সূরা রা’দ: ২৮)

প্রতাপশালী এবং ওপর মহলের একটু সুদৃষ্টি পাওয়ার জন্য মানুষ কত রকমের চেষ্টা তদবির করে থাকে। অথচ তেমন কোন কষ্ট ছাড়াই জিকিরের মাধ্যমে মহাপ্রতাপশালী এবং সর্বশক্তিমানের নৈকট্য অর্জন করা যায়। সুবহানাল্লাহ!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বান্দা যখন আমার জিকির করে তখন আমি তার সাথে থাকি। বান্দা যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। বান্দা কোনো মজলিসে আমার কথা আলোচনা করলে আমি তার চেয়ে উত্তম মজলিসে তার আলোচনা করি। (সহীহ মুসলিম: ২৬৭৫)

এছাড়া কুরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব। (সূরা বাকারা: ১৫২)

কিয়ামতের কঠিন সেই দিনে আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না। সেই বিপদের সময় যিকিরকারী ব্যক্তিরা আরশের শীতল ছায়াতলে ঠাঁই পাবেন ইন শা আল্লহ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় স্থান

দিবেন। তাদের একজন হলো, যে নিরিবিলি আল্লাহর জিকির করেছে এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে। (সহীহ বুখারী: ৬৪৭৯)

নবীজিকে একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের বিধান তো অনেক। আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যার উপর আমি সর্বদা আমল করতে পারি। নবীজি বললেন, তোমার জিহবাকে আল্লাহর জিকিরে তরতাজা রাখ। (জামে তিরমিযী:৩৩৭৫)

অপর এক হাদিসে নবীজি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, বান্দা যতক্ষণ আমাকে স্মরণ করতে থাকে এবং আমার যিকিরের কারণে তার ঠোঁট নড়তে থাকে, ততক্ষণ আমি তার সাথে থাকি। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত তার সাথে থাকে। (ইবনে মাজাহ- ৩৭৯২)

জিকিরের মজলিস হচ্ছে অন্যসব মজলিস থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবাদতের মজলিস আল্লাহর রহমত চাদরে আবৃত থাকে। নবীজির ইরশাদ করেন, যখন মানুষ আল্লাহর জিকির করে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং তাদের উপর সাকিনা নাযিল হয়, আর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সামনে তাদের কথা আলোচনা করেন। (সহীহ মুসলিম: ৭০০)

কোন জিকির আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়? আমরা বেশি বেশি কোন জিকির করব?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আকবার এই চারটি জিকির আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়।(সহীহ বুখারী- ৬৩০২)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর জান্নাতিরা দুনিয়ার কোনো জিনিসের জন্য আফসোস করবে না, শুধু এসময়টুকুর জন্য আফসোস করবে যা দুনিয়াতে আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস: ১৬৭৪৬)

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে আল্লাহ তার জন্য শয়তান নিয়োজিত করে দেই। অতঃপর সে তার সঙ্গী হয়। আর শয়তান মানুষকে সৎ পথে বাধা দান করে অথচ মানুষ মনে করে যে সে সৎ পথেই আছে। (সূরা যুখরুফ-৩৬)

কুরআনের অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে, যে আল্লাহর জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে। (সূরা তহা-১২৫)

তাওহীদ

অন্তরের রোগ চিহ্নিত করতে তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

তাওহীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ- এক করা, একক ও অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করা, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। শারী'য়াতের পরিভাষায় তাওহীদের অর্থ হলো- আল্লাহ্‌কে তাঁর সুমহান জাত (সত্তা)

সর্বসুন্দর নাম ও সিফাতে (গুণরাজি-বৈশিষ্ট্যে) এবং তাঁর অধিকার, কর্ম ও কর্তৃত্বে এক, একক ও অদ্বিতীয় ঘোষণা ও সাব্যস্ত করা, এবং এসব ক্ষেত্রে নিজের কথা, কাজ ও বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ব অক্ষুন্ন রাখা।

তাওহীদ তিন প্রকার যথা:-

(১) তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ। আর তা হলো- নিজের কথা, কাজ ও বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহ্‌কে তাঁর যাবতীয় কর্ম ও কর্তৃত্বে এক ও অদ্বিতীয় তথা লা-শরীক (অংশীদারহীন) সাব্যস্ত করা।

(২) তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ। অর্থাৎ- ‘ইবাদাতে আল্লাহ্‌র একত্ব অক্ষুন্ন রাখা। অন্য কথায়, ‘ইবাদাতে আল্লাহ্‌র একত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) তাওহীদুল আছমা ওয়াস্‌সিফাত। অর্থাৎ- আল্লাহ্‌কে তাঁর নাম ও গুণাবলীতে এক ও অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করা। অন্য কথায়, আল্লাহ্‌র সুমহান নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহ্‌র একত্ব অক্ষুন্ন রাখা।

“সাব্যস্ত করার” অর্থ হলো- নিজের ‘আক্বীদাহ-বিশ্বাসে, কথা-বার্তায় ও কাজে-কর্মে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

তাওয়াজু

তাওয়াজু অর্থ বিনয়।

বিনয় মানুষকে উচ্চাসনে সমাসীন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে সহায়তা করে। বিনয়ীকে মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। যে যত বেশী বিনয়ী ও নম্র হয় সে তত বেশী উন্নতি লাভ করতে পারে। এ পৃথিবীতে যারা আজীবন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় আসন লাভ করে আছেন তাদের প্রত্যেকেই বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিনয়ী ও নম্র মানুষ ছিলেন শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি ছিলেন বিনয় ও নম্রতার মূর্তপ্রতীক। তাইতো মহান আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন এভাবে :

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

‘আর নিশ্চয়ই তুমি সুমহান চরিত্রের অধিকারী’

(সূরা কালাম ৬৮/৪)।

আবূ যায়েদ বিসত্বামী (রহঃ) বলেন,

هو أن لا يرى لنفسه مقامًا ولا حالاً، ولا يرى في الخلق شرًا منه

‘বিনয় হ’ল নিজের জন্য কোন অবস্থান মনে না করা এবং সৃষ্টি জগতে নিজের চেয়ে অন্যকে অবস্থান ও অবস্থায় নিকৃষ্ট মনে না করা’।

ইবনু আতা বলেন,

هو قبول الحق ممن كان العز في التواضع، فمن طلبه في الكبر فهو كطلب الماء من النار

‘যে কোন ব্যক্তি থেকে সত্যকে গ্রহণ করা। সম্মান হ’ল নম্রতায়। যে ব্যক্তি অহংকারে তা তালাশ করবে, তা হবে আগুন থেকে পানি তালাশতুল্য’।[হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম জাওযিইয়া, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ খ্রীঃ), ২/৩১৪ পৃঃ।]

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ) বলেছেন,

رَأْسُ التَّوَاضُعِ أَنْ تَضَعَ نَفْسَكَ عِنْدَ مَنْ هُوَ دُوْنَكَ فِيْ نِعْمَةِ الدُّنْيَا، حَتَّى تُعْلِمَهُ أَنْ لَيْسَ لَكَ بِدُنْيَاكَ عَلَيْهِ فَضْلٌ، وَأَنْ تَرْفَعَ نَفْسَكَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَكَ فِي نِعْمَةِ الدُّنْيَا، حَتَّى تُعْلِمَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بِدُنْيَاهُ عَلَيْكَ فَضْلٌ-

‘বিনয় ও নম্রতার মূল হ’ল, তুমি তোমার দুনিয়ার নে‘মতের ক্ষেত্রে নিজেকে তোমার নীচের স্তরের লোকদের সাথে রাখ, যাতে তুমি তাকে বুঝাতে পার যে, তোমার দুনিয়া নিয়ে তুমি তার চেয়ে মর্যাদাবান নও। আর নিজেকে উঁচু করে দেখাবে তোমার চেয়ে দুনিয়াবী নে‘মত নিয়ে উঁচু ব্যক্তির নিকট, যাতে তুমি তাকে বুঝাতে পার যে, দুনিয়া নিয়ে সে তোমার উপর মর্যাদাবান নয়’।[আবূবকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিদ দুনিয়া, আত-তওয়াযু ওয়াল খামূল (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯হিঃ/১৯৮৯ খ্রীঃ), পৃঃ ১৬৫।]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) তাঁর শিষ্যদের বলেন,

)أتدرون ما الرفق) قالوا: قل يا أبا محمد! قال: أن تضع الأمور في مواضعها: الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه.

‘তোমরা কি জান নম্রতা কি? তারা বলল, আপনি বলুন, হে আবূ মুহাম্মাদ! তিনি বললেন, প্রত্যেক বিষয়কে যথাস্থানে রাখা। কঠোরতাকে স্বস্থানে, নম্রতাকে তার স্থানে, তরবারিকে যথাস্থানে, চাবুককে তার স্থানে রাখা’।[ফায়যুল কাদীর ৪/৭৩ পৃঃ।]

ক্ষেত্র বিবেচনায় বিনয় ও নম্রতাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

মানুষের সাথে আচার-আচরণে নম্রতা অবলম্বনের বিষয়ে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ-

‘আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হ’তে, তবে তারা তোমার আশপাশ হ’তে দূরে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর ভরসা কর। ভরসাকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন’ (আলে ইমরান ৩/১৫৯)।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন,

لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لاَ تَغْضَبْ.

'তুমি রাগ করো না। সে লোকটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল। তিনি বললেন, 'তুমি রাগ করো না'।[বুখারী হা/৬১১৬; মুসলিম হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১০৪।]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

'মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং হত্যা করা কুফরী'।[বুখারী হা/৬০৪৪; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।]

চাকরদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। ইবনু ওমর (রাঃ) একদা মাটি থেকে এক খন্ড কাঠি অথবা অন্য কোন বস্ত নিয়ে বললেন, তাকে আযাদ করার মধ্যে এর সমপরিমাণ পুণ্যও নেই। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَه -

'যে ব্যক্তি নিজ ক্রীতদাসকে চপেটাঘাত করল অথবা প্রহার করল, এর কাফফারা হ'ল তাকে মুক্ত করে দেয়া'।[মুসলিম হা/১৬৫৭; আবু দাউদ হা/৫১৬৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৫২৭।]

এটা হচ্ছে ক্রীতদাসের সাথে ইসলাম নির্দেশিত আচরণ।

চাকর-চাকরাণী ও গৃহপরিচারিকার সাথে সদাচরণ করার জন্যও ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَه.

'তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকে যদি সাথে না বসায় তাহ'লে সে যেন তাকে এক লুকমা বা দু'লুকমা খাবার দেয়। কেননা সে তার গরম ও কষ্ট সহ্য করেছে'।[বুখারী হা/৫৪৬০; মুসলিম হা/১৬৬৩।]

জীব-জন্তু ও পশু-পাখির সাথেও নম্রতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিশাম ইবনু যায়দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-এর সঙ্গে হাকাম ইবনু আইয়ূবের কাছে গেলাম। তখন আনাস (রাঃ) দেখলেন, কয়েকটি বালক কিংবা বর্ণনাকারী বলেছেন, কয়েকজন তরুণ একটি মুরগী বেঁধে তার দিকে তীর ছুঁড়ছে। আনাস (রাঃ) বললেন,

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

'নবী করীম (ছাঃ) জীবজন্তুকে বেঁধে এভাবে তীর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন'।[বুখারী হা/৫৫১৩; মুসলিম হা/১৯৫৬; আবু দাউদ হা/২৮১৬।]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনু ওমর (রাঃ) কতিপয় কুরায়শ যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখি বেঁধে সেটির দিকে তীর নিক্ষেপ করছিল। আর প্রত্যেকটি নিশানা ব্যর্থ হওয়ার কারণে তারা পাখির মালিকের জন্য একটি করে তীর নির্ধারণ করছিল। তারপর তারা ইবনু ওমর (রাঃ)-কে দেখে আলাদা হয়ে গেল। ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন,

مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا.

'কে এ কাজ করলো? যে ব্যক্তি এরূপ করেছে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে লা'নত করেছেন, যে কোন জীব-জন্তুকে লক্ষ্যস্থল বানায়'।[মুসলিম হা/১৯৫৮; মিশকাত হা/৪০৭৫]

শাদ্দাদ ইবনু আওস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হ'তে আমি দু'টি কথা মনে রেখেছি, তিনি বলেছেন,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর 'ইহসান' অত্যাবশ্যক করেছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে, দয়ার্দ্রতার সঙ্গে হত্যা করবে, আর যখন যবেহ করবে তখন দয়ার সঙ্গে যবেহ করবে। তোমাদের সবাই যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুকে কষ্টে না ফেলে'।[*মুসলিম হা/১৯৫৫; আবু দাউদ হা/২৮১৫; ছহীহাহ হা/৩১৩০।*]

আল্লাহ রাববুল আলামীন ধীর-স্থিরতা ও নম্রতা অবলম্বন পূর্বক সংযত হয়ে চলাফেরা করার জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ -

'সংযত হয়ে চলাফেরা করো এবং তোমার কণ্ঠস্বরকে সংযত রাখো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর' (লোক্বমান ৩১/১৯)।

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে,

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْن -

'তুমি তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হও' (শু'আরা ২৬/২১৫)।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার ইহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসার জন্য অনুমতি চেয়ে বলল, السَّامُ عَلَيْكَ 'আপনার মৃত্যু ঘটুক'। তখন আমি উত্তরে বললাম, عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ 'বরং তোমাদের মৃত্যু ঘটুক এবং অভিশম্পাত বর্ষিত হোক'। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'হে আয়েশা! থাম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে কোমলতাকেই পসন্দ করেন। উত্তরে আমি বললাম,

তারা যা বলেছে, আপনি কি তা শোনেননি? তিনি বললেন, আমি তো 'ওয়ালাইকুম' বলে (তাদের কথা তাদের দিকে ফিরিয়ে) দিয়েছি।[13]

অপর বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইহুদীরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, 'আসসামু আলাইকা' 'আপনার মৃত্যু হোক'। উত্তরে তিনি বললেন, ওয়ালাইকুম। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমাদের মৃত্যু হোক, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অভিশম্পাত বর্ষণ করুন এবং তোমাদের উপর রুষ্ট হোন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আয়েশা! থাম, নম্রতা অবলম্বন করো, কঠোরতা ও অশালীনতা পরিহার করো'।[বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।]

وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ,,
أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِىْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

'আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অহী করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রদর্শন করবে, যাতে কেউ কারো উপর বাড়াবাড়ি ও গর্ব না করে'।[মুসলিম হা/২৮৬৫; আবুদাঊদ হা/৪৮৯৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৫; ছহীহাহ হা/৫৭০।]

মহান আল্লাহ বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের মানুষদের প্রশংসায় বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً، وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً، وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً-

'দয়াময় আল্লাহর বান্দা তো তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'। আর যারা রাত্রি অতিবাহিত করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত থেকে ও দন্ডায়মান হয়ে এবং যারা বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। নিশ্চয়ই তা অবস্থান ও আবাসস্থল হিসাবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট' (ফুরক্বান ২৫/৬৩-৬৬)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

'এটা আখিরাতের নিবাস যা আমি নির্ধারণ করি তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম' (ক্বাছাছ ২৮/৮৩)।

পক্ষান্তরে উদ্ধত অহংকারী দাম্ভিকদের সম্পর্কে আল্লাহ রাববুল আলামীন কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ-

'অহংকার বশে তুমি মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পসন্দ করেন না' (লোক্বমান ৩১/১৮)।

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً-

‘পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই তুমি পদভারে ভূপৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনও পর্বত সম হ’তে পারবে না’ (বনী ইসরাঈল ১৭/৩৭)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ

‘মুমিন ব্যক্তি নম্র ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে পাপী মানুষ ধূর্ত ও চরিত্রহীন হয়’।[তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫।]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ-

‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকের সংবাদ দিব না? আর তারা হ’ল সরলতার দরুণ দুর্বল, যাদেরকে লোকেরা হীন, তুচ্ছ ও দুর্বল মনে করে। তারা কোন বিষয়ে কসম করলে আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সংবাদ দিব না? আর তারা হ’ল প্রত্যেক অনর্থক কথা নিয়ে ঝগড়াকারী বদমেযাজী ও অহংকারী’।[*মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৬।*]

ঔদ্ধত্যপরায়ণ, অহংকারীদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِىْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْخَبَالِ

‘ক্বিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিপীলিকার ন্যায় জড়ো করা হবে। অবশ্য আকৃতি-অবয়ব হবে মানুষের। অপমান তাদেরকে চতুর্দিক হ’তে বেষ্টন করে রাখবে। ‘বুলাস’ নামক জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। অগ্নিশিখা তাদের উপর ছেয়ে যাবে। আর তাদেরকে পান করানো হবে জাহান্নামীদের দেহনিঃসৃত ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ নামক কদর্য পুঁজ-রক্ত’।[তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১১২।]

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা কোমল, তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন। আর তিনি কোমলতার প্রতি যত অনুগ্রহ করেন, কঠোরতা বা অন্য কোন আচরণের প্রতি ততটা অনুগ্রহ করেন না’।[*মুসলিম হা/২৫৯৩; মিশকাত হা/৫০৬৮*]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছেন, ‘কোমলতা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হ’তে নিজেকে বাঁচাও। কারণ যাতে নম্রতা ও কোমলতা থাকে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। আর যাতে কোমলতা থাকে না, তা দোষণীয় হয়ে পড়ে’।[মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৮।]

মন্দকে মন্দ দ্বারা, শত্রুকে শত্রুতা দ্বারা প্রতিহত না করে বরং বিনয়-নম্রতা ও উৎকৃষ্ট ব্যবহার দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে মানুষের হৃদয় জয় করতে হয়। মহান আল্লাহ এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন,

وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَن ُ

‘ভাল ও মন্দ সমান হ’তে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত’ (হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا,

‘তোমরা নম্র হও, কঠোর হয়ো না। শান্তি দান কর, বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না’।[বুখারী হা/৬১২৫।]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ

‘মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমরা সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত’ (মুমিনূন ২৩/৯৬)।

অন্যত্র তিনি বলেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْن,

‘ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল’ (আ‘রাফ ৭/১৯৯)।

ইবনু মারদুবিয়া (রহঃ) সা‘দ ইবনু ওবাদা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওহোদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা হামযাহ (রাঃ)-কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লাশটিকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা হামযাহ (রাঃ)-এর সাথে এহেন আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলে দেয়া হয় যে, এটা আপনার জন্য সমীচীন নয়; বরং আপনার মর্যাদার উপযোগী হ’ল ক্ষমা ও অব্যাহতি দান’।[*তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য*।]

তাযকিয়াহ

তাযকিয়াহ অর্থ পবিত্রতা।

তাযকিয়াহ’-র ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন, তাযকিয়াহ শব্দটি ‘যাকাত’ থেকে গৃহীত। যাকাত অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। এ সকল আয়াতে ‘তাযকিয়া’ অর্থও পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুমিনগণকে শিরক ও গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণও এভাবেই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর আনুগত্য, ইখলাস ও

নির্ভেজাল তাওহীদের মাধ্যমে তাদের তাযকিয়া করেন। তাবিয়ী ইবনু জুরাইজ বলেন, তিনি তাদেরকে শিরক থেকে পবিত্র করেন।[তাবারী, তাফসীরে তাবারী (জামিউল বাইয়ান) ১/৫৫৮।]

এভাবে আমরা দেখছি যে, দীনের সকল কর্মই 'তাযকিয়া'-র অন্তভর্ক্তু ; কারণ সকল কমর্ই মুমিনকে কোনো না কোনোভাবে পবিত্র করে এবং তার সাওয়াব, মর্যাদা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে। তবে এক্ষেত্রে হার্দিক বা মানসিক বিষয়গুলির প্রতি কুরআন ও হাদীসে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআনকে সকল মনোরোগের চিকিৎসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ "হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার চিকিৎসা।"[সূরা ইউনুস ৫৭। আরো দেখুন সূরা বানী ইসরাঈল ৮২ ও সূরা ফুসসিলাত ৪৪ নং আয়াত।]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "জেনে রাখ! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে, যদি তা সংশোধিত হয় তবে পুরো দেহই সংশোধিত হয় আর যদি তা নষ্ট হয় তবে পুরো দেহই নষ্ট হয়। জেনে রাখ তা অন্তঃকরণ।"[বুখারী, আস-সহীহ ১/২৮; মুসলিম আস-সহীহ ৩/১২১৯।]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, উপরে বেলায়াতের পথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির পর্যায় ও কর্ম। আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রেও ফরয ও নফল এবং করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম রয়েছে। মনকে শিরক, কুফর, আত্মপ্রেম, কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে নিজের পছনদকে গুরুত্ব প্রদান, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি থেকে হৃদয়কে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। এগুলি বর্জনীয় মানসিক কর্ম। মনকে ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহর রহমতের আশা, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি, নির্লোভতা, সকলের প্রতি ভালবাসা, কল্যাণকামনা ইত্যাদি বিষয় দিয়ে পরিপূর্ণ করতে হবে। এগুলি করণীয় মানসিক কর্ম। এগুলির ফরয ও নফল পর্যায় আছে। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শির্ক, আত্মপ্রেম ইত্যাদিতে মন ভরে রেখে পাশাপাশি সবর, শোকর, ক্রন্দন ইত্যাদি গুণ অর্জনের চেষ্টা করা বিভ্রান্তি ও ভন্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

ইহসান

আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ- তিনি কুরআন মাজীদে তাঁর পছন্দনীয় আমল ও গুণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এগুলো যারা অর্জন করবে, তিনি তাদের ভালবাসবেন। সেসব গুণের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ হল 'ইহসান'। আর এই গুণের অধিকারীকে বলা হয় মুহসিন। ইহসান আল্লাহ তাআলার অতি পছন্দনীয় একটি গুণ।

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“তোমরা ইহসান কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা ইহসানকারীদের ভালবাসেন”। (সূরা বাকারাঃ ১৯৫)

আল্লাহ্ তাআ’লা আরও বলেনঃ

إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার (আল্লাহভীরু) এবং যারা সৎকর্ম করে।” (সূরা নাহাল -১২৮)

আল্লাহ্ তাআ’লা আরও বলেনঃ

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

“আর যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ন হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল”। (সূরা লুকমানঃ ২২)

আল্লাহ তাআ’লা আরও বলেনঃ

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

“যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম বস্তু (জান্নাত) এবং আরও অতিরিক্ত নেয়ামত (আল্লাহর দীদার)”। (সূরা ইউনুসঃ ২৬) আল্লাহ তাআ’লা আরও বলেনঃ

هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ

“উত্তম কাজের পুরস্কার উত্তম (জান্নাত) ব্যতীত আর কি হতে পারে”? (সূরা আর্ রাহমানঃ ৬০) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

“আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জিনিষের উপর ইহসান আবশ্যক করেছেন”।[মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সায়েদ ওয়ায্ যাবায়েহ।]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(نِعِمَّا لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَبِصحابة سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَه)

“ঐ ক্রীতদাসের জন্য সৌভাগ্য, যে ইহ্সানের সাথে (উত্তম ভাবে) আল্লাহর এবাদত এবং একনিষ্ঠতার সাথে স্বীয় মনিবের খেদমত করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল। সে কতই না সৌভাগ্যবান”।[মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান]

মুজাহাদা

(মুজাহাদা) শব্দটির উৎপত্তি جهد থেকে। جهد অর্থ চেষ্টা, শ্রম, শক্তি ও সামর্থ্য। مجاهدة অর্থ সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সামর্থ্য ব্যয় করা। দীনের প্রচারপ্রসারের কাজে এবং দীনের পথে চলার ক্ষেত্রে যে সকল বাধাবিপত্তি দেখা দেয়, তার প্রতিরোধে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা ও সর্বোচ্চ সংগ্রাম-সাধনাকে 'মুজাহাদা' বলে।

মুজাহাদা তিন প্রকারঃ-

ক. প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা;

খ. শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করা;

গ. নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

দীনের পথে চলতে হলে মানুষকে এ তিনও প্রকার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। কখনও প্রকাশ্য শত্রু পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের শুরু থেকেই মুশরিক, ইহুদী, খ্রিষ্টান প্রভৃতি অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা দিয়ে এসেছে। যারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চায়, তাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের সে শত্রুতা আজও সমানতালে অব্যাহত আছে। অতীতের সাহসী মুসলিমগণ কখনও সে শত্রুতায় দমে যায়নি। তারা সর্বাবস্থায় সত্যদীনের উপর অটল থেকেছে এবং জানমাল দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাদের সে সংগ্রামীজীবন আমাদের পথচলার অনুপ্রেরণা।

ইসলাম তার অনুসারীকে এ তিনও প্রকার মুজাহাদা ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহ যোগায়। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ-

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ

অর্থ : এবং তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। সূরা হজ্জ, আয়াত ৭৮

উল্লিখিত তিনও প্রকার মুজাহাদাই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ-

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

অর্থ : এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর।সূরা তাওবা, আয়াত ৪১

প্রকাশ থাকে যে, কাফের ও মুশরিকদের সঙ্গে যখন প্রয়োজন হয় তখন সসস্ত্র যুদ্ধ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদত। ইসলামী পরিভাষায় এরূপ সংগ্রামকে ‘জিহাদ' বলা হয়ে থাকে। কুরআন ও হাদীছে এর বিপুল ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। শয়তান ও নফসের বিরুদ্ধে যে লড়াই করতে হয় সে লড়াইকে সাধারণত ‘মুজাহাদা' বলা হয়। জিহাদ শব্দটি মৌলিকভাবে সসস্ত্র সংগ্রামের জন্যই প্রযোজ্য, যদিও এর আভিধানিক অর্থ ব্যাপক এবং সে হিসেবে সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজে নিষেধ করা, দলীল-প্রমাণ দ্বারা বাতিলপন্থিদের রদ করা, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে জানমাল খরচ করা, সামাজিক রেওয়াজ-প্রথার বিপরীতে দাঁড়িয়ে দীনের রীতিনীতি

আঁকড়ে ধরে রাখা এবং আল্লাহর ইবাদত–বন্দেগী ও শরী'আতের অনুশাসন মেনে চলায় নফসের বিরুদ্ধাচারণে রত থাকা সবই জিহাদের আভিধানিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ(69) َ

অর্থ : যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।সূরা আনকাবূত, আয়াত ৬৯

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا(8)

অর্থ : এবং তোমার প্রতিপালকের নামের যিকির কর এবং সকলের থেকে পৃথক হয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে থাক।সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত ৮

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ(99) ُ

অর্থ : এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক, যাবৎ না যার আগমন সুনিশ্চিত তোমার কাছে তা এসে যায়।সুরা হিজর, আয়াত ৯৯

তাফাক্কুর

তাফাক্কুর অর্থ চিন্তা ভাবনা করা।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অন্য প্রাণীর চেয়ে মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। যার ফলে সে অন্যান্য প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করেছে। মানুষকে আল্লাহ তাআলা বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন, দিয়েছেন চিন্তা করার শক্তি। মানুষ তার বিবেক বুদ্ধি দিয়ে, মেধা খাটিয়ে নানা কিছু উদ্ভাবন করছে। এটি আল্লাহ তাআলার অপার দয়া, দান।

কোরআনে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জায়গায় তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তার কথা বলেছেন।

ইরশাদ হয়েছে, '(হে নবী!) তাদের বলো, লক্ষ করে দেখ, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে কী কী জিনিস আছে? কিন্তু যেসব লোক ঈমান আনার নয়, (আসমান ও জমিনে বিরাজমান) নিদর্শনাবলি ও সতর্ককারী (নবী) তাদের কোনো কাজে আসে না।' (সুরা : ইউনুস, আয়াত : ১০১)

অন্য আয়াতে এসেছে, 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন, তাতে পাহাড় ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রত্যেক প্রকার ফল জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাতের চাদরে আবৃত করেন। নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে সেই সব লোকের জন্য নিদর্শন আছে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।' (সুরা : রাদ, আয়াত : ৩)

আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে মানুষ যখন চিন্তা-ভাবনা করে তখন তার ভেতরে পরিবর্তন আসে, জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি হয়। মানুষ যখন তার নিজের সৃষ্টি নিয়েই চিন্তা করবে, তখনই তার জন্য সঠিক পথে চলা সহজ হবে। এই চিন্তা-ভাবনা তাকে সত্য পথে চলতে সহায়তা করবে।
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'অতএব, মানুষের দেখা উচিত কী বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে।
এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে।' (সুরা : আত-তারিক, আয়াত : ৫-৭)
কোরআনে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জিনিসকে বিভিন্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষ যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যেন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। মানুষ যখন কোরআন পড়বে, কোরআন বুঝবে, কোরআন অনুযায়ী আমল করবে, তখন শয়তান মানুষকে সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, '(হে রাসুল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতের মধ্যে চিন্তা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।' (সুরা : ছ্বদ, আয়াত : ২৯)
প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরআনের একটি আয়াত নিয়ে চিন্তা করতে করতে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) ভোর পর্যন্ত একটি আয়াত দিয়েই নামাজ আদায় করলেন। আর সে আয়াতখানা হলো, অর্থ : 'আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ১১৮) (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ১০১০)
মানুষ যখন আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করবে তখন তার মাঝে আল্লাহর বড়ত্ব ও আল্লাহর অসীম ক্ষমতা বুঝতে পারবে। বিশাল ও সুগভীর সমুদ্রজগৎ, মাটিতে গচ্ছিত বিভিন্ন খনিজসম্পদ, সুউচ্চ পর্বতমালা—এমন সব আল্লাহর সৃষ্টি জীব নিয়ে চিন্তা করা। ইরশাদ হয়েছে, 'তবে কি তারা লক্ষ করে না উটের প্রতি, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং আকাশের প্রতি, কিভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে? এবং পাহাড়ের প্রতি, কিভাবে তাকে প্রোথিত করা হয়েছে? এবং ভূমির প্রতি, কিভাবে তা বিছানো হয়েছে? সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তুমি তো একজন উপদেশদাতাই।' (সুরা : গাশিয়া, আয়াত : ১৭-২১)
মরণের পর কী হবে, মৃত্যু-পরবর্তী জীবন কবর, হাশর, পুনরুত্থান, পুলসিরাত, আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান—এসব বিষয় নিয়ে যখন মানুষ চিন্তা-ভাবনা করবে তখন তা মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরে আসতে সাহায্য করবে।
যারা চিন্তা-ভাবনা করে না তাদের জন্য ভৎর্সনা, তিরস্কার, নিন্দা ও ধমক এসেছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তারা কি কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, নাকি অন্তরে লেগে আছে তার (সংশ্লিষ্ট) তালা? (সুরা : মুহাম্মাদ, আয়াত : ২৪)
অন্য আয়াতে এসেছে, 'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে, তাদের আমি আমার নিদর্শনাবলি থেকে বিমুখ করে রাখব। তারা সব রকমের নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে

না। তারা যদি হিদায়াতের সরল পথ দেখতে পায়, তবে তাকে নিজের পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না, আর যদি গোমরাহির পথ দেখতে পায়, তাকে নিজের পথ বানাবে। কারণ তারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা থেকে বিলকুল গাফিল হয়ে গেছে।' (সুরা : আল-আরাফ, আয়াত : ১৪৬)

তবে আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা নিষেধ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর নিয়ামতরাজি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কর, তবে আল্লাহ তাআলার সত্তাকে নিয়ে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (তাবারানি, হাদিস : ৬৩১৯)

মানুষ যদি আল্লাহ তালাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে মানুষ এর কূলকিনারা খুঁজে পাবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা মানুষের চিন্তা-ভাবনা থেকে বহু গুণে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তাঁর (আল্লাহর) মতো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা এবং তিনি সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা : আশ-শুরা, আয়াত : ১১)

তাদাব্বুর

তাদাব্বুর অর্থ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। কুরআনের একটা দাবিতে আমরা প্রায় সবাই পিছিয়ে – সেটা হচ্ছে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করা - যেটাকে আরবীতে বলে তাদাব্বুর, আর ইংরেজীতে বলে Contemplation।

অথচ এই তাদাব্বুর করা কিন্তু কুরআনের দাবী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে বলেন:

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَ قْفَالُهَا ٢٤

ওরা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর (গভীর চিন্তা) করে না? নাকি ওদের অন্তরে তালা লাগানো? (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:২৪)

এই আয়াতের আগের-পরের কয়েকটা আয়াত পড়ে এর প্রেক্ষাপট যদি দেখা যায় তাহলে বুঝা যায়, এখানে আল্লাহ আসলে মুনাফিকদেরকে বর্ণনা করেছেন। এর মানে দাঁড়ায়, তাদাব্বুর না করে শুধু কুরআন পড়ে যাওয়া মুনাফিকদের একটা বৈশিষ্ট্য। এই আয়াতের আরেকটি অর্থ এরকমও হয় – যারা নিয়মিত কুরআন পড়ছে, এটা নিয়ে চিন্তাও করছে, কিন্তু তারপরেও তাদের আচার-আচরণ মুনাফিকের মত রয়ে গেছে – এদের অন্তরে তালা লেগে গেছে – এদের মিথ্যবাদীতা, অহংকার ও পাপগুলোর কারণে কুরআনের আয়াতগুলো তাদের আচার-আচরণে কোন প্রভাব ফেলছে না।

তাহলে এটা বোঝা গেল, যে আমাদের তাদাব্বুর করতে হবে। কুরআনের ২-৩টা আয়াত পড়ব, তারপর চিন্তা করব - এই আয়াতটা আমার জন্য কিভাবে প্রযোজ্য? আমার জীবনে এটা আমি কিভাবে এপ্লাই করব? নিজেকে কিভাবে ইম্প্রুভ করব? - এটাই হচ্ছে তাদাব্বুর।

অনেকেই তাদাব্বুর আর তাফসীর এর মধ্যে মিলিয়ে ফেলেন। কেউ হয়ত বলবে – আরে আমি তো আরবী জানিনা, আমি কিভাবে তাদাব্বুর করব? আমি তো হাদিস জানি না, আমি তো সীরাত জানি না – আমি কিভাবে তাদাব্বুর করব?

মহান আল্লাহ তাদাব্বুর করার জন্য এরকম কোন পূর্ব শর্ত দেননি।সাধারণ মুসলিম যেমন তাদাব্বুর করতে পারে, বিচক্ষন আলেমও তেমনি তাদাব্বুর করতে পারে। কুরআন এমন একটি গ্রন্থ, যা আপনার জ্ঞানের লেভেল অনুসারে আপনার কাছে ধরা দিবে। আপনি কিছু আয়াত পড়বেন, তাদাব্বুর করবেন, মনে প্রশ্ন আসবে, প্রাসংগিক হাদিস / শানে নুজুল পড়বেন, আবার তাদাব্বুর করবেন, এবার আগের চেয়েও বেশী বুঝবেন, আয়াতগুলো নিয়ে আবার চিন্তা করবেন, নিজের জীবনে কিভাবে এপ্লাই করবেন তা চিন্তা করবেন, আরো প্রশ্ন আসবে, আরো পড়বেন/জানবেন, এভাবে চলতেই থাকবে।

আয়াতের তাফসীর করতে হলে আলেম হতে হয়, তাদাব্বুর করতে হলে হতে হয় না। ইমাম আস-সুয়ুতির মতে একজন তাফসিরবিদকে আরবী গ্রামার, উপমা, আকিদা, ফিকহ, যুক্তিবিদ্যাসহ জ্ঞানের কমপক্ষে ১৫টি শাখায় দক্ষ হতে হয়। তাফসির বলে দেয় আয়াতের প্রকৃত অর্থ, আয়াতে আল্লাহ কি বুঝাতে চাইছেন, কি বুঝাতে চাইছেন না। তাফসিরবিদেরা তাদাব্বুরের সীমা নির্ধারণ করে দেন। একজন তাফসিরবিদ তার তাফসীর গ্রন্থে আয়াতের অর্থের সীমা নির্ধারণ করার পর – তাদাব্বুর করতেও পারেন, আবার না-ও পারেন।

আসুন একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে অনুবাদ, তাফসীর ও তাদাব্বুরের পার্থক্য বুঝা যাক।

আমরা সবাই জানি কুরআনের সুরাগুলো শুরু হয় – "বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম" দিয়ে। এর অনুবাদ কি? "পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি"।

আপনি শুধু এই অনুবাদটুকু পড়েই তাদাব্বুর শুরু করতে পারেন। আজকে সকাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত মহান আল্লাহর কি কি করুণা, কি কি দয়া আপনি উপভোগ করেছেন? আপনি আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে উঠেছেন, সকালে নাস্তা খেয়েছেন, নিজের পায়ে চলাফেরা করেছেন, নিজের চোখে এই লেখাটি পড়ছেন। কত মানুষের পরিবার নেই, আপনার পরিবার আছে। কত মানুষের চেয়ার থেকে উঠে বসার শক্তি নেই আপনার আছে।

এরপর আপনি একই আয়াতের তাফসীর পড়লেন। তাফসীর থেকে আপনি আর-রহমান ও আর-রহিম শব্দের পার্থক্য জানলেন। রহমান বলতে বুঝায় দয়ার প্রচন্ডতা, আল্লাহ ভীষণ দয়ালু এটা বুঝায়। আর রহিম বলতে বুঝায় ঠিক এই মুহূর্তে আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করছেন, প্রতি মুহুর্তে আপনার প্রতি দয়া করে যাচ্ছেন সেটা। রহমান হচ্ছে আল্লাহর সার্বজনীন দয়া যা তিনি সব ধর্মের মানুষকেই দিয়ে থাকেন। আর রহিম হচ্ছে সেই দয়া যা মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট, বিশেষ করে পরকালে আল্লাহ মুসলিমদের প্রতি রহিম হবেন। এই তাফসীর জানার পর আপনার তাদাব্বুরে ভিন্ন মাত্রা আসবে। আপনি চাইবেন, মহান আল্লাহ শুধু রহমান নয়, রহিম হিসেবেও আপনাকে দয়া করুন।

আমরা যে যতটুকুই জানি, কুরআনের আয়াত পড়ে সেটা নিয়ে চিন্তা করব, তাদাব্বুর করব। ইমাম ইবনুল কায়্যিম এর মতে – তাদাব্বুর করার চাইতে মঙ্গল আর কোন কিছুই বান্দার দুনিয়া বা আখিরাতের জন্য নাই। তাদাব্বুর, প্রশ্ন, আরো জানা, নিজের জীবনে সেই জানার প্রয়োগ, আবার তাদাব্বুর – এই চক্র চলতেই থাকুক।

তাহাজ্জুদ

আমাদের জন্য এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর জীবনসঙ্গীনী ও মুমিন-জননী হযরত আয়েশা রা.-এর যবান থেকেই এর একটি বিবরণ শুনুন। উরওয়া রাহ. বলেন, আয়েশা রা. বলেন-

كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا.

(নবীজী) রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত বেশি নামায পড়তেন যে, তাঁর পাও মোবারক ফুলে যেতো। এ দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট করছেন, অথচ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার কি উচিত নয় যে, (এই মহা অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে) আমি একজন পূর্ণ শোকর আদায়কারী বান্দা হব?' -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮২০

তাহাজ্জুদ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বেচ্ছায় তো ছাড়তেনই না, কখনো অনিচ্ছায় ছুটে গেলেও কাযা করে নিতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকেই বর্ণিত, রোগ-ব্যাধি কিংবা অন্য কোনো কারণে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারতেন, তবে দিনের বেলায় বারো রাকাত আদায় করে নিতেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৬

অন্য বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে কাইস রা.-কে হযরত আয়েশা রা. বললেন-

ياعَبْدَ اللهِ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا.

হে আবদুল্লাহ! কিয়ামুল লাইল কখনো ছেড়ো না! কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কখনো ছাড়েননি। কখনো অসুস্থতা বা দুর্বলতা বোধ করলে বসে আদায় করতেন। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩০৯

জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে নবীজির খেদমতে আসতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মাঝে ওহীর জ্ঞান ও ঊর্ধ্বজগতের খবর পৌঁছানোর গুরুদায়িত্বটা ন্যস্ত ছিল তাঁর কাঁধে। নবীজীর কাছে আসতেন এবং কিছু উপদেশ ও নসীহত শুনিয়ে আবার সরে যেতেন

মানবপরিবেশ থেকে। একদিন উপদেশ শোনানোর পর তিনি নবীজীকে একটি অসাধারণ দর্শন জানালেন-

يَا مُحَمّدُ! شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللّيْلِ وَعِزّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النّاس.

قال المنذري في الترغيب والترهيب ৩৩৩ /১: إسناده حسن، وأشار إلى ثبوته الهيثمي في مجمع الزوائد২৫৩ /২ ،

হে মুহাম্মাদ! মুমিনের মর্যাদা কিয়ামুল লাইল- রাতে দাঁড়িয়ে নামায আদায় ও বিভিন্ন বন্দেগীর মধ্যে, আর তাঁর সম্মান মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষিতার মধ্যে। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৯২১; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৪২৭৮

পাঁচ ওয়াক্ত নামায মুমিনের পরিচয়। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর পরই যে নামায আল্লাহর কাছে প্রিয় তা হল তাহাজ্জুদ। হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীস; নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرّمُ، وَأَفْضَلُ الصّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاَةُ اللّيْلِ.

রমযানের পর রোযা রাখার উত্তম সময় মুহাররম মাস আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায রাতের নামায, অর্থাৎ তাহাজ্জুদ। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২৫

তাহাজ্জুদ গোনাহ মিটিয়ে দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللّيْلِ فَإِنّهُ دَأَبُ الصّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ.

তোমরা কিয়ামুল লাইলের প্রতি যত্নবান হও। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সালেহীনের অভ্যাস এবং রবের নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। আর তা পাপরাশী মোচনকারী এবং গোনাহ থেকে বাধা প্রদানকারী। -জামে তিরমিযি, হাদীস ৩৫৪৯; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১১৫৬

পবিত্র কুরআনে মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِیْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْن.

সেদিন নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে। -সূরা যারিয়াত (৫১) : ১৫

সাথে তাদের কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণও এসেছে। তন্মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল-

وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْن.

রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। -সূরা যারিয়াত (৫১): ১৮

ইবাদুর রহমান-রহমানের বান্দাদের কতিপয় বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে কারীমের সূরা ফুরকানে। সেখানেও উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি বিবৃত হয়েছে-

وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا.

আর তাঁরা রাত অতিবাহিত করে তাঁদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৬৪

সূরার শেষের দিকে তাদের পুরস্কারের বিবরণও এসেছে-

أُولَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا، خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا.

তাদের প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ। কারণ তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট! -সূরা ফুরকান (২৫) : ৭৫-৭৬

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় এলেন, মানুষের সাথে আমিও তাঁকে একনজর দেখবার জন্য বের হলাম। তাঁর চেহারা মোবারকের দিকে যখন তাকালাম, আমার বিশ্বাস হয়ে গেল, এ কোনো মিথ্যাবাদির চেহারা হতে পারে না। তখন তাঁর মুখে সর্বপ্রথম আমি যে কথাগুলো শুনেছি-

يَا أَيّهَا النّاسُ، أَفْشُوا السّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ، وَصَلّوا وَالنّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنّةَ بِسَلاَمٍ.

হে লোকসকল! সালামের প্রসার কর। মানুষকে আহার করাও! আর রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন তুমি নামায আদায় কর! তবেই নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। -জামে তিরমিযি, হাদীস ২৪৮৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩২৫১

অন্য হাদীসে পাওয়া যায়, উপরোক্ত গুণাবলী যাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, জান্নাতে থাকবে তাঁদের জন্য বিশেষ মর্যাদা। হযরত আবু মালেক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ فِي الْجَنّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلّى وَالنّاسُ نِيَامٌ.

নিশ্চয়ই জান্নাতে রয়েছে এমন কিছু কক্ষ/প্রাসাদ, যার বাহির থেকে ভেতরাংশ দেখা যাবে, ভেতর থেকে বহিরাংশ দেখা যাবে। এগুলো আল্লাহ তাঁদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, যারা মানুষকে খাবার খাওয়ায়, কোমল ভাষায় কথা বলে, ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখে, সালামের প্রসার ঘটায় এবং রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তারা নামাযে দণ্ডায়মান থাকে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫০৯; জামে তিরমিযি, হাদীস ২৫২৭

উপরিউক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও রয়েছে অন্তরের চিকিৎসা করার বিভিন্ন উপায় যেমন :
সৎ সঙ্গ,কুরআন তিলাওয়াত,ইলম অর্জন,হালাল রুজি, দুয়া ইত্যাদি।

উপসংহার

পরিশেষে আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহমুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ. লেখা এবং মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইনের অনুবাদকৃত আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার বই থেকে কিছু অন্তর জুড়ানো লেখা দিয়ে শেষ করছি।

“আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা ও তাসাওউফ হাসিল করা ফরজ।

মানুষ নানা ধরনের জ্ঞান অর্জন করে বিভিন্ন আবিষ্কার করে নিজেদেরকে সভ্য ও উন্নত জাতি বলে দাবী করলেও আত্মার অসৎ স্বভাবের জন্য সমাজে সংসারে রাষ্ট্রে সর্বত্রই চরম অশান্তি বিরাজ করছে জাগতিক উন্নতির শিখরে যতই পৌছাক মানুষ যত দিন আত্মার উন্নতিতে না পৌঁছবে এ উন্নয়ন মানুষের দ্বারা মানুষের অ কল্যাণ সর্বনাশ ডেকে আনবে।

যা আজ আমাদের গোটা সমাজে মহামারী ক্যান্সারের ন্যায় আক্রমণ করছে ইসলামের তাহজিব তামাদদন. জাতিসত্তা, সার্বভৌম এবং সভ্যতার সর্বনাশ ডেকে আনছে,

তা হলো , হিংসা, অহংকার রিয়া সহ যাবতীয় আত্মার ব্যাধি সমুহ।

মৌলিক ভাবে দশ প্রকার (মুহলিকাত)

তবে লোভ, হিংসা, অহংকার রোধ করার ক্ষমতা মানুষের হাতেই বিদ্যামান। মুহলিকাতের অসৎ স্বভাবের চার ধারার ইলম শিক্ষা ও আমল করে

মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের মহা বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে।

দুনিয়া ও আখেরাতে ধংস কারি মহা ঘাতক ব্যাধি , হিংসা, অহংকার লোভ রিয়া সহ দশ প্রকার মৌলিক ব্যাধির (মুহলিকাত) জন্য নানা রকম ভয়ংকর পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

অ সৎ স্বভাব , হিংসা, অহংকার লোভ রিয়া ও অসৎ স্বভাব সমুহ মানুষকে অমানুষ করে তুলে।

সর্ব স্তরে সামাজিক সমস্ত বিপর্যয়ের কারন হলো(মুহলিকাত) বা অ সৎ স্বভাব

হিংসা, অহংকার লোভ রিয়া ও অসৎ স্বভাবই সমস্ত অন্যায় ও পাপের জন্ম দেয়। যেমন- খুন, গুম, মানব পাচার, চুরি ডাকাতি যৌতুক, মাদক,

জংগিবাদ , খাদ্যে ভেজাল সুদ ঘুষ

অস্ত্রবাজি সহ যাবতীয় পাপের মুলেই হলো এই অসৎ স্বভাব এ বিষয়ে হুজ্জাতুল ইমাম গাযযালী রহঃ এর ঐতিহাসিক প্রবাদ

مغارس الفواحش منابت الأعمال محضور,

অর্থঃ সমাজে সংসারে রাষ্ট্রে যাবতীয় পাপাচারের মূলেই হলো এই অ সৎ স্বভাব সমূহ (মুহলিকাত)

অনাদিকাল হতেই সামগ্রিকভাবে মানুষের চরিত্রের দুটি দিক বিবেচিত হয়ে আসছে এর একটি ভালো(মুনজিয়াত) সৎ স্বভাব

সুবিচার, অঙ্গীকার, সহানুভূতি, দয়া, দানশীলতা, উদারতা, অত্মসংযমী, কর্তব্যপরাণয়তা, সৌহার্দ্য, আন্তরিকতা, মিষ্টভাষী, কমল স্বভাব, হিতাকাক্সক্ষী, সৎকর্মশীল, পুণ্যবান মানব সমাজকে চিরকালই ভালো মানুষ হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে।

মন্দ স্বভাব (মুহলিকাত)

অপরদিকে প্রবৃত্তির অনুসারী ধোঁকাবাজ, মুনাফিক, জেদী, মিথ্যাবাদী, জুলুমবাজ, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা, রুক্ষ আচরণকারী, কুটিল, সংকীর্ণতা, দায়িত্বহীনতা, নিপীড়ন, কুৎসা, চোগলখোরি, বেয়াদব, চোর, ডাকাত, ঘুষখোর, সুদখোর, হিংসা, লোভ, অহংকারীদের চিরকালই

ঘৃণার দৃষ্টিতে মূল্যায়িত করা হয়েছে। এ ধরনের মানুষকে জাতি কখনো ভালো লোকের মধ্যে পরিগণিত করেনি।

অসৎ স্বভাব লোভ, হিংসা, অহংকার এর ভয়াবহ পরিণতির বিষয়সহ অসভ্য সমাজ ও জাতিকে সভ্যতায় রূপান্তরিত করার জন্য পবিত্র মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনে বহু জায়গায় সতর্ক সাবধান বাণী এসেছে।

১। "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।" (৫ঃ৩)

২। "রাসূল (সা.) তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।" (৫৯ঃ৭)

৩। "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তারা অবশ্যই মহা সফলতা অর্জন করবে।" (সূরা আহ্যাব : ৭১)

৪। "আমিতো আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

৫। "সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত, নিশ্চয়ই মিথ্যার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী।" (সূরা ইসরা : ৮১)

৬। "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। যে ব্যাক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, শেষ দিবসে মুক্তির কামনা করে এবং আল্লহকে অধিক স্মরণ করে।" (৩৩ঃ২১)

৭। "জমিনের উপর অহংকার সহকারে চলো না। নিশ্চয়ই তুমি জমীন ভেদ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনো পর্বত সমান হতে পারবে না।" (সূরা বানী ইসরাইল : ৩৭)

৮। "আল্লাহর রহমানের বান্দাহ তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা তর্ক করতে থাকে তখন তারা বলে সালাম।" (সূরা ফোরকান : ৬৩)

৯। "তাদের অন্তরে অহংকার ছাড়া কিছুই নেই, তারা সেই অহংকার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।" (সূরা আল-মুমিন : ৫৬)

১০। "আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব-অহংকার করে।" (সূরা আরাফ : ১৪৬)

১১। "অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং জমিনে গর্বসহকারে পদচারণা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। চালচলনে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর নিচু করে। নিঃসন্দেহে গাধার আওয়াজই সর্বপেক্ষ অপ্রীতিকর।" (সূরা লোকমান : ১৮-১৯)

১২। “এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং গোলোযোগ সৃষ্টি করতে চায় না। মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।” (সূরা কাসাস ; ৮৩)

১৩। “অনুরূপভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী শক্তিধরের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন।” (সূরা আল-মুমিন : ৩৫)

১৪। “যারা আমার ইবাদত থেকে গর্ব ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (সূরা আল-মুমিন : ৬০)

১৫। “আপনাকে সারা বিশে^র সব মানুষের জন্যই সুসংবাদ দানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।” (৩৪ঃ২৮)

১৬। “হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সাচ্চা মুমিনদের সঙ্গে থাকো।” (সূরা তাওবা : ১১৯)

১৭। “তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূল সাঃ এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” (৩৩ঃ১১)

১৮। “আল্লাহতায়ালা তোমাদের সুবিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন।” (১৬ঃ৯০)

১৯। “ হে নবী বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বপ্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।” (৬ঃ১৬২)

২০। “হে ইমানদারগণ তোমরা যা কর না, তা কেন বলো?” (৬১ঃ২) ২১। “তোমরা কি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করো? আর নিজের ব্যাপারে তা বেমালুম ভুলে থাকো?” (২ঃ৪৪)

২২। “আল্লাহর বিশেষ রহমতের তোমার হৃদয়টি মানব জাতির জন্য কোমল করে দেওয়া হয়েছে।” (সূরা আল- ইমরান : ১৫৯)

২৩। “আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।” (সূরা আল-আহযাব : ২১) ২৪। “হে নবী মুহাম্মদ তুমি নীতি নৈতিকতার উত্তম চরিত্রে সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত।”

২৫। “একমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করেন।” (সূরা ফাতির : ২৮)

২৬। “ফিতনা-ফ্যাসাদের অবসান এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। অতঃপর যদি তারা যুদ্ধে বিরত থাকে তবে যালিমগণ ব্যতীত আর কাউকে আক্রমণ করবে না।” (সূরা বাকারা : ১৯৩)

২৭। “তোমরাই হবে বিজয়ী-যদি তোমরা (সত্যিকারের) মুমিন হও ” (সূরা আল-ইমরান : ১৩৯)

২৮। “আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির প্রকৃতিতে ভালো এবং মন্দের জ্ঞান সাভাবিক ভাবেই দান করেছেন।”(সূরা আস-শাম্স : ৮)

২৯। “তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, নিজেও সৎ কর্ম করে এবং বলে আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

সৎ কাজ ও মন্দ কাজ সমান হতে পারে না। মন্দ ও প্রতিহত মহত্তম পন্থায়। তাহলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।" (সূরা হামীম আস্ সিজদা : ৩৩-৩৪)

৩০। নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে মন্দ কথা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

৩১। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংজ্ঘনকারী এবং মিথ্যা বাদীকে সৎপথে পরিচালনা করেন না।

৩২। অশান্তি(ফিৎনা) যুদ্ধ হতেও গুরুতর।

কাজেই হিংসা ক্রোধ লোভ অহংকার পরিত্যাগ করে একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন ভঙ্গিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাতে করে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, দেশ এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে এসব অসৎ গুণের প্রভাবে পরিস্থিতি ভয়ংকর আকার ধারণ না করে। এর শেষ পরিণামের আগেই আমাদের কুরআনের ও হাদিসের ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জিবন বিধানের পথেই ফিরে আসতে হবে।

এক্ষেত্রে যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা, অনৈতিকতা ও অনিষ্টকর কর্মকা- থেকে বিরত থাকার এবং শান্তির সমাজ বিনির্মাণে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর বেশ কয়েকটি বাণী পাঠকের তুলে ধরা হলো

১। "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে সম্মানিত বান্দাহ হিসাবে তৈরি করেছেন, উদ্ধত ও অহংকারী হিসাবে নয়।"

২। "রোগীর সেবা, জানাযায় অংশগ্রহণ, হাঁচির জবাব, দাওয়াত কবুল, সালামের প্রসারের, নির্দেশ দিচ্ছি।

৩। "রোগী দেখতে যাও, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও এবং বন্দী মুক্ত করো।

৪। "যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন মুমিনের একটি কষ্ট দূর করে, আল্লাহ পরকালে তার একটি কষ্ট দূর করবেন।

৫। "ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বান্দাহর সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য করেন।

৬। "কোন নেক কাজকে তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তোমার ভাইয়ের সাথে খোশ মেজাজে এবং হাসি মুখে সাক্ষাৎই হোকনা কেন।

৭। "ভালো শব্দ উচ্চরণ করাও সাদ্কাহ।

৮। যে ব্যক্তি অহংকার বসত লুঙ্গি চেঁচিয়ে চলে হাশরের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।" ৯। "আল্লাহর যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

১০। "সেই ব্যক্তি মুমিন যার নিকট লোকেরা নিরাপদ, সেই ব্যক্তি মুসলিম যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ।

১১। "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে যে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

১২। "আল্লাহর নিকট সে সাথী সর্বোত্তম যে নিজ সাথীর কাছে সর্বোত্তম আর আল্লাহর কাছে সেই প্রতিবেশী সর্বোত্তম যে নিজ প্রতিবেশীর কাছে সর্বোত্তম।

১৩। “তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাকো, আগুন যেমন কাঠকে জ্বালিয়ে দেয় তেমনি হিংসা নেক ও সওয়াবকে জ্বালিয়ে দেয়।

১৪। “যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

১৫। “যে ব্যক্তি কুস্তিতে মানুষকে পরাজিত করে সে শক্তিশালী নয়, বরং সে ব্যক্তি শক্তিশালী যে রাগের সময় ধৈর্য ধারণ করতে পারে।

১৬। “আল্লাহ তোমাদের কে বিনয় অবলম্বনের জন্য আদেশ পাঠিয়েছেন যাতে করে তোমরা একে অপরের উপর গর্ব না কর এবং একে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করো।

১৭। “যে নিজেকে বড় মনে করে এবং অহংকারের মনোভাব প্রকাশ করে, সে আল্লাহর সাথে যখন মিলিত হবে তখন আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন।

১৮। “যার অন্তরে অণুপরিমাণ অহংকার আছে সে বেহেশতে যেতে পারবে না। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও দূরে ঠেলে দেয়া এবং মানুষকে ঘৃণা করা।

১৯। “যে ব্যক্তি মানুষের উপর দয়া করে না, আল্লাহও তার উপর দয়া করেন না।”

২০। “দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।”

২১। “সুন্দর ব্যবহারই সওয়াব।”

২২। “আমাকে উত্তম চরিত্রে পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।”

২৩। “ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী। ২৪। যিনি বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন করেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।”

২৬। “যে ব্যক্তির স্বভাবে নম্রতা নেই সর্বপ্রকার কল্যাণ হতে সে বঞ্চিত।”

২৭। “যার মধ্যে বিনয় নেই, সে সকল ভালো গুণাবলী থেকে বঞ্চিত।”

এমতাবস্থায় জাতিকে কল্যাণ ও পরিত্রাণের একমাত্র মুক্তির পথ দেখাতে পারে ইসলামের সুমহান বাণী ও আদর্শ জীবন দর্শন, যা মানবতার সর্বোত্তম রক্ষা কবচ ও বিমূর্ত প্রতীক। আর ইসলামের মৌলিক শিক্ষাই হচ্ছে।

আকাঈদ তাসাওউফ ও ফিকহের সমষ্টি পূর্নাঈ দ্বীন ইসলাম

সৃষ্টিকর্তার ভয়, আদর্শের অনুশীলন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং সর্বোপরি কামিল ইন্সানিয়াত হাসিল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করা। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফরজ পরিমাণ জ্ঞানার্জন, আত্মসমালচনা, আত্মশুদ্ধি ও বিবেকের শিক্ষাকে রপ্ত করার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে।

অতএব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে হিংসা, অহংকার রিয়া রাগ, লোভ, অহংকারের পরিণতি শুভ হয় না। বরং এর পরিণতি হয় ভয়াবহ ও ভয়ংকর।

আত্মা নামে আমরা যাকে বুঝি তাকে আরবি ভাষায় কালব বলে। শরীর যেমন সুস্থ থাকে আবার অসুস্থও হয় তেমনি আত্মাও সুস্থ থাকে আবার অসুস্থও হয়।

তাই শরীর অসুস্থ হলে যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন, তেমনি আত্মার অসুস্থতার জন্যও চিকিৎসার প্রয়োজন। বরং সেটি ফরজ। এ ব্যাপারে হজরত নুমান বিন বশির (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, 'শুনে রেখো, নিশ্চয়ই শরীরে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে, যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা রোগাক্রান্ত থাকে, তখন গোটা শরীরই অসুস্থ থাকে। শুনে রেখো, সেই গোশতের টুকরা হলো কলব তথা আত্মা। ' (বুখারি শরিফ)।

হজরত উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, 'একদিন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, নাজাতের উপায় কী? তিনি বললেন, নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো, নিজের ঘরে পড়ে থাকো এবং নিজের পাপের জন্য কাঁদো। ' (তিরমিজি)
হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'যখন আদম সন্তান ভোরে উঠে, তখন তার অঙ্গগুলো জিহ্বাকে বিনয়ের সঙ্গে বলে, আমাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা আমরা সবাই তোমার সঙ্গে জড়িত।
সুতরাং তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব। আর তুমি বাঁকা হলে আমরাও বাঁকা হয়ে পড়ব। ' (তিরমিজি)
হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন কোনো বান্দা মিথ্যা বলে, তখন এর দুর্গন্ধে ফেরেশতারা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়। ' (তিরমিজি)
হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, সাফিয়া সম্পর্কে আপনাকে এটুকু বলাই যথেষ্ট, সে এরূপ এরূপ। তিনি এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তিনি বেঁটে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'যদি তোমার এ কথাকে সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এটা সমুদ্রের রং পরিবর্তন করে দেবে। ' (আবু দাউদ)
হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা কোনো (মুসলমান) ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, ঠাট্টা করবে না এবং এমন ওয়াদা করবে না, যা রক্ষা করতে পারবে না। ' (তিরমিজি)
হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা বদ ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ ধারণা হচ্ছে নিকৃষ্ট মিথ্যা। তোমরা আড়ি পেত না, গোপন দোষ অন্বেষণ করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও। ' (বুখারি)
হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। ' (আবু দাউদ)

হজরত জাবের (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন বহুমুখী অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে। আর তোমরা লোভ এবং কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা লোভ ও কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। লোভ ও কৃপণতার বশবর্তী হয়ে তারা পরস্পর রক্তপাত করেছে এবং নিজেদের ওপর হারাম বস্তুকে হালাল করেছে। ' (মুসলিম)

হজরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের নেক আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছিত করবেন। আর যে ব্যক্তি এ জন্য লোকসম্মুখে নিজের নেক আমল প্রকাশ করে যে মানুষ তাকে মহৎ মনে করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার অন্তরের অবস্থা সবার সামনে প্রকাশ করে দেবেন। ' (বুখারি)

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, 'রাগ করো না। ' সে কয়েকবার এই কথা জিজ্ঞেস করল, আর রাসুলুল্লাহ (সা.)ও প্রতিবার একই জবাব দিলেন যে 'তুমি রাগ করো না। ' (বুখারি)

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'অন্যকে ধরাশায়ী করতে পারলেই বীর হওয়া যায় না; বরং প্রকৃত বীর হলো ওই ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ' (বুখারি)

হজরত বাহাজ ইবনে হাকিম (রা.) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ক্রোধ ইমানকে এমনভাবে বিনষ্ট করে, যেমনি 'ছাবির' মধুকে বিনষ্ট করে দেয়। ' (ছাবির এক প্রকার তিতা ফল, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তা পাওয়া যায়)। (তিরমিজি)

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। আর যে ব্যক্তি নিজের গোস্সা দমন করে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার ওপর থেকে আজাব সরিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহপাক তার ওজর কবুল করেন। ' (শু'আবুল ইমান)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এমন কোনো ব্যক্তি দোজখে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ইমান থাকবে। পক্ষান্তরে এমন কোনো ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে। ' (মুসলিম)

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা বলেন, অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইজার। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোনো একটি নিয়ে আমার সঙ্গে টানাটানি করবে, আমি তাকে দোজখে ঢোকাব। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তাকে আমি দোজখে নিক্ষেপ করব। ' (মুসলিম)

হজরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মানুষ এমনভাবে আত্মগর্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে অবশেষে তার নাম ঔদ্ধত-অহংকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে তার ওপর সেই আজাবই নেমে আসে, যা তাদের ওপর নেমে থাকে। ' (তিরমিজি)
হজরত আবু সাঈদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলো এক এক বিঘত ও এক এক হাত পরিমাণে অনুসরণ করে চলবে, এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢুকে থাকে, তাহলে তোমরাও এ ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তারা কি ইহুদ ও নাসারা! তিনি বললেন, তবে আর কারা!? (বুখারি)
উপরোল্লিখিত হাদিসগুলো এ কথা প্রমাণ করে যে মানুষের শরীরের মতো মানুষের অন্তরও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। যেসব রোগের একেকটি এত বেশি ক্ষতিকর যে একটি রোগই যেকোনো মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই শরীর রোগাক্রান্ত হলে যেমনি আমরা তার চিকিৎসা করে থাকি, তেমনি আত্মা রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা করাও জরুরি। বরং আত্মার রোগের চিকিৎসা শরীরের রোগের তুলনায় অনেক বেশি জরুরি।
কোরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা আত্মার রোগের চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, 'যে ব্যক্তি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাবে, সে সফলকাম হবে। ' (সুরা শামস-৯)
এই আয়াতের তাফসিরে হাসান বসরী (রা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই সফলকাম হবে ওই ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাবে তথা আত্মাকে সংশোধন করাবে এবং আত্মাকে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর উদ্বুদ্ধ করবে। (তাফসিরে মাজহারি)
এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ তায়ালা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে বলেছেন। বোঝা গেল, আত্মা একা একা পরিশুদ্ধ হয় না; বরং কোনো আহলে দিল কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল পীর বা বুজুর্গের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করাতে হয়। তাই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে নিজেদের আত্মার চিকিৎসা করিয়েছেন, পরিশুদ্ধ করিয়েছেন। নিজের আত্মার চিকিৎসা নিজে করেননি। তাই আমাদের জন্য ফরজ হলো কোনো হক্কানী ও নায়েবে নবীর মাধ্যমে নিজ আত্মার চিকিৎসা করানো। শরীরের রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন আমরা ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়ে থাকি, ঠিক তেমনি আত্মার রোগের চিকিৎসার জন্য যাঁরা আত্মার রোগের পরামর্শপত্র দেন, তাঁদের দ্বারস্থ হতে হবে। হ্যাঁ, পার্থক্য শুধু এতটুকু যে আত্মার রোগের চিকিৎসা করা ফরজ আর শরীরের রোগের চিকিৎসা করা সুন্নাত। যারা আত্মার রোগের চিকিৎসা না করেই মারা যাবে, তাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আর ব্যর্থকর্ম হবে সে, যে আত্মাকে (গুনাহের মধ্যে) ধসিয়ে দেবে। ' (সুরা শামস-১০) তা ছাড়া হাদিসেও তাদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে এসে আত্মার চিকিৎসা না করালে ইহুদি-খ্রিস্টানদের অনুসরণ করতে বাধ্য করা হবে।

আত্মার রোগের চিকিৎসা না করালে শহীদ, আলেম ও দানবীরদের করুণ অবস্থা হবে। যেমন হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে, সে হবে একজন শহীদ (ধর্মযুদ্ধে প্রাণদানকারী)। তাকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে আনা হবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাকে (প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত) নেয়ামতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন; আর সেও তা (নেয়ামতপ্রাপ্তির কথা) স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'তুমি এসব নেয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়ায় কী আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করোনি; বরং তুমি এজন্য লড়াই করেছ যে তোমাকে বীর বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে (ফেরেশতাদের) আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। এরপর এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে নিজে দ্বীনি ইলম শিখেছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে আর সে কোরআন শরিফও পড়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকেও দুনিয়ার নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্মরণ করবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য তুমি কী আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি এবং অন্যকেও তা শিখিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কোরআন মজিদ পড়েছি। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এজন্য ইলম শিখেছ, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয় আর এজন্য কোরআন পড়েছ, যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। এরপর এমন ব্যক্তির বিচার শুরু হবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের অর্থ-সম্পদ দান করে বিত্তবান বানিয়েছিলেন। তাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে তার প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এসব নেয়ামতের মোকাবিলায় তুমি আমার জন্য কী করেছ? সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ করো তার একটিও আমি হাতছাড়া করিনি। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এজন্য দান করেছ, যাতে করে তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানা হবে, অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ' (সহিহ মুসলিম, হা. নং-১৯০৫)

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত, নিজ আত্মার ব্যাধির ব্যাপারে সতর্ক ও যত্নবান হওয়া। হক্কানি কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল পীর বা নায়েবে রাসূল পর্যায়ের যিনি ফিকাহ ও তাসাওউফের ইলমে পারদর্শী এবং তিনি নিজেও আত্মার পরিশুদ্ধি হাসিল করেছেন কোন কামিল শায়খ্ থেকে অনুমতি ও লাভ করেছেন এবং পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের উপর নিজেও অটল আছেন এমন

হক্কানী শায়খকে নিজ আত্মার অবস্থা জানিয়ে আত্মার ব্যাধি সমূহের জরুরী ইলম চার ধারায় শিক্ষা ও আমলের মাধ্যমে তাহার সূহবত অর্জন করে কঠোর রিয়াজত মুজাহিদার মাধ্যমে নিজ আত্মার চিকিৎসা করা অপরিহার্য (ফরজ)

মহান আল্লাহ পাক সকল মুসলিম উম্মাহ কে আত্মার পরিশুদ্ধীর মহা জরুরী ইলম অর্জন করে কালবে সালিম অর্জন করে পরিশুদ্ধ আত্মা (নফসে মুতমাইননা) হাসিল করার তাওফিক দান করুন।

তথ্যসূত্র:

অনেক আর্টিকেল থেকে তথ্য উপাত্ত নেয়া হয়েছিল এর মাঝে কিছু নিচে উল্লেখ করা হলো যেখান থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে:

১.https://www.ajkerpatrika.com/islam/ajpzlq0rzrs9t
২.https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=79&chapter=9569
৩.https://www.alkawsar.com/bn/article/2253/
৪.https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10077
৫.https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10078
৬.https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6659
৭.
https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?pageNum_mainHadith=3&totalRows_mainHadith=364&book=27&section=697
৮.https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7233
৯. https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3892
১০.
https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?book=20&section=505
১১. https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=133&section=1694
১৩. https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=62&chapter=8766
১৪.https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=114&chapter=10513
১৫.
https://muslimbangla.com/article/374/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A6%AB%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%AE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2
১৬. https://at-tahreek.com/article_details/4961

১৭.https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8722
১৮.https://www.alkawsar.com/bn/article/118/
১৯.https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11973
২০.https://www.alkawsar.com/bn/article/2867/
২১.https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11974
২২.https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11105
২৩.https://www.muslimbangla.com/hadith/58213
২৪.https://www.alkawsar.com/bn/article/3059/
২৫.https://archive.org/download/IslamicOthersBooks3/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE.pdf
২৬.https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2023/10/06/1324232
২৭.https://ahlehaqmedia.com/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0/
২৮.https://www.alkawsar.com/bn/article/1408/
২৯.https://quraneralo.net/thought-in-action-reality/
৩০.https://at-tahreek.com/article_details/10784
৩১.https://www.facebook.com/KoranOHadis/posts/702521585379481/
৩২.https://www.alkawsar.com/bn/article/2918/
৩৩.https://medium.com/@tanvirraj/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-4d153d7cfc7f
৩৪.https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?book=24&section=625
৩৫.https://www.alkawsar.com/bn/article/2707/
৩৬.https://www.alkawsar.com/bn/article/1724/
৩৭.https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?book=3&section=287

৩৮.https://quraneralo.net/gaining-knowledge-only-for-the-pleasure-of-allah/
৩৯.https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?pageNum_mainHadith=1&totalRows_mainHadith=111&book=1&section=22
৪০.https://www.alkawsar.com/bn/article/2794/
৪১.https://quraneralo.net/tahajjud/